# ডানা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

বনফুল

ডি, এম, লাইব্রেরী
কলিকাতা

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৫৫

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত যদি প্রচুর বই দিয়ে আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে 'ডানা' লেখা সম্ভব হ'ত না আমার পক্ষে। শুধু বই নয় অনেক উপদেশও তিনি দিয়েছেন পাখীর বিষয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে' বিদেশী-প্রথায় হাতে-হাতে ঋণ-শোধ করবার বাসনা আমার নেই। তাঁর কাছে আমি ঋণীই রইলাম।

রথযাত্রা, ১৩৫৫
ভাগলপুর।

"বনফুল"

১

কবি এবং বৈজ্ঞানিক বেরিয়েছেন পরিভ্রমণ করতে। সঙ্গে আছেন বন্ধু রূপচাঁদ মৌলিক। রূপচাঁদ কবিও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, অথচ উভয় জগতেই গতিবিধি আছে কিঞ্চিৎ। উভয় জগতেরই রূপ রস গন্ধ তাঁকে আকুল করে। কিন্তু মাত্রা হারিয়ে ফেলেন না তিনি কখনও। বিদগ্ধ ব্যক্তি, কিন্তু তাল-বোধ আছে। অর্থাৎ আত্মহারা হন, কিন্তু ঠিক সময়ে আপিস যেতে ভুল হয় না। সেদিন তিন বন্ধু বেরিয়েছিলেন পক্ষীপর্যবেক্ষণে। শুধু তাই নয়, মনস্থ করেছেন, বরাবরই বেরুবেন যতদিন না পক্ষী-পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। বাতুল বৈজ্ঞানিক প্রলুব্ধ করেছেন কবিকে, এবং এই দুই উন্মাদকে সামলাবার জন্যে বেরিয়েছেন রূপচাঁদ। তিনজনেরই পকেটে দূরবীন। কবির মনশ্ছন্দবীণা অবিরাম-গুঞ্জরিতভাব, বৈজ্ঞানিক সর্বদা চকিতদৃষ্টি একাগ্র, রূপচাঁদ স্থির-মস্তিষ্ক বস্তুতান্ত্রিক।

কবির মনে কবিতা জাগছিল।

নির্মল নীল শীতের আকাশ, ঝলমল করে সোনালি আলো,<br>
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে<br>
কোথা তুমি ওগো, ঢাল গো ঢাল—<br>
মরকত মণি কি আবেগে দেখ চুম্বিছে নীলকান্তরে।

যব-গম-ছোলা-মটর-মহিমা
ছাড়ায়ে যেতেছে উপমার সীমা
ধরার ধূসর ধূলি উজলিয়া
সবুজের শিখা উঠেছে জ্বলিয়া
প্রাণের দীপালী জ্বলে জ্বলজ্বল কি চঞ্চল অশান্ত রে!
কোথা তুমি ওগো ঢাল গো ঢাল,
টলমল করে সবুজ সোহাগ দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে
নির্মল নীল শীতের আকাশে ঝলমল করে সোনালি আলো।

"শুনুন"

কবি বৈজ্ঞানিকের দিকে ফিরে চাইলেন। দেখলেন, তিনি একটা ঝোপের পাশে গুঁড়ি মেরে ব'সে আছেন। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আবার। ডেকেই দূরবীন লাগালেন চোখে। তারপর চুপি-চুপি বললেন, "বারবেট একটা, আস্তে আস্তে আসুন। ওই যে, এই দিকটায় ঘুরে আসুন, ওই দেখুন।"

তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ ক'রে কবিও লাগালেন দূরবীন। পাখি দেখা গেল না, কিন্তু বটের পাতাগুলো কি অপরূপ! এমন ক'রে আর কোনও দিন দেখা হয় নি তো!

"উড়ে গিয়ে ওই নিমগাছটায় বসল গিয়ে। আসুন, এই দিক দিয়ে যাওয়া যাক।"

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে প্রায় দৌড়ে ছুটলেন বৈজ্ঞানিক নিমগাছটার দিকে। কবিও ছুটলেন।

'কুড় কুড় কুড় কুড় কুড়, কুড়্রুক, কুড়্রুক, কড়্রুক।'

ডেকে উঠল পাখিটা।

"ওইটেই ডাকছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার ডাক তো! নাম কি ওর?"

বৈজ্ঞানিক আস্তে আস্তে আর একটু এগিয়ে একটা ঝোপের ধারে গুঁড়ি মেরে ব'সে ছিলেন। কবিও এগুলেন সেদিকে।

"ওর নামটা কি ?"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস ক'রে তর্জন ক'রে উঠলেন, "চুপ, কথা বলবেন না।"

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি। হঠাৎ কবির দিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বললেন, "নীচের দিকের ওই যে ছোট্ট ডালটা বেঁকে আছে, ওর ওপরে দেখুন।"

কবি দূরবীন লাগালেন, কিন্তু পাখি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন রুক্ষ-মাথা ময়লা-কাপড়-পরা একটা বুড়ী, হেঁট হয়ে কাঠ কুড়োচ্ছে।

"উড়ে গেল আবার। দেখতে পেলেন ?"

"না"

"ইউক্যালিপ্‌টাস গাছটায় বসল। চলুন, যাওয়া যাক।"

"কি নাম পাখিটার ?"

"ইংরেজীতে বলে বারবেট। অনেক রকম বারবেট আছে। এ অঞ্চলে আর এক জাতের বারবেট আছে, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কপারস্মিথ। বৈজ্ঞানিক নাম Xantholaema Haemucephala। বাংলা নাম বসন্তবউরি। সবুজ রঙ, তার ওপর হালকা সাদার ডোরা কাটা বুকের কাছটায়। ছোট পাখিটার মাথায় আর বুকে লাল। বড়টার মাথার রঙ তামাটে। ছোট পাখিটার অনেকগুলো দেশী নাম আছে—গয়লাবুড়ী, ভগীরথ, কলাপাখি, জোকারে পাখি। ওই শুনুন, ছোট পাখিটা মানে, গয়লাবুড়ী ডাকছে।"

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্—'

"কাঁসারিরা বাসন তৈরি করবার সময় যেমন শব্দ করে অনেকটা সেইরকম, নয় ?"

'কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক।'

'টংক্ টংক্ টংক্ টুক্ টুক্ টুক্।'

বনবাদাড় ভেঙে হনহন ক'রে এগিয়ে চলেছেন বৈজ্ঞানিক। কবি চলেছেন পিছু পিছু। তাঁর মনে কবিতা জাগছে।

গাছের ডালে সবুজ পাতার ফাঁকে
গয়লাবুড়ী থাকে।
পরনে তার সবুজ ডুরে
গান করে সে মিষ্টি সুরে
আকাশ জুড়ে গানের ছবি আঁকে।

প্রবীণ বুড়ী নয় সে মোটে
ছোট্ট পাখি কি ছটফটে
সহজ চোখে যায় না দেখা তাকে,
ফুড়ুৎ ক'রে পালায় উড়ে
সুর ঢালে সে আকাশ জুড়ে
পালিয়ে বেড়ায় বনের আঁকে বাঁকে।

মাথায় বুকে লালের টিকা
জ্বলছে যেন অগ্নি-শিখা
স্বপ্ন যেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে,
ও ভগীরথ, কি সুর হেনে
কোন্ গঙ্গা আনবে টেনে
সারাটা দিন ডাকছ তুমি কাকে!

চলতে চলতে কবি আর একবার দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখি দেখা গেল না, দেখা গেল সেই বুড়ীটাকে। নোংরা বুড়ী। দারিদ্র্যজীর্ণ। দেখে মায়া হয়, কিন্তু বড় বেমানান। এখানে ও কেন? মহত্ত্ব যেখানে বিগলিত হয়ে পড়ছে শত ধারায় সেইখানে গিয়ে ও স্নান ক'রে আসুক। রূপের আসরে ওকে মানাচ্ছে না একটুও।

নিমডালে ঝরিতেছে সবুজের ঝরনা
বলে যেন, সর্ না, ওরে বুড়ী সর্ না।

না যদি সরিস্ তবে
চল্ সেই উৎসবে
ছুটে চল্ সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।
ফুল যেথা ফুটে আছে
থরে থরে কাননে
হাসি করে ঝিকি-মিকি
নয়নে ও আননে

যেথা জোনাকির ঝাঁকে
পরীরা লুকিয়ে থাকে
দারিদ্র্যে করে যারা
বিচিত্র-বর্ণা
ছুটে চল্ সেই দেশে
যেথা কেউ পর না।

বুড়ী মিলিয়ে গেল, নিমগাছ মিলিয়ে গেল, সহসা কবির অন্তর জুড়ে বেজে উঠল নূতন একটা সুর। সেই চিরন্তন না-পাওয়ার সুর, অন্তরের অন্তস্থল থেকে কারণে অকারণে যা উৎসারিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ওগো,
ওগো আগুন, ওগো আমার শিখা,
অন্তরালে লুকিয়ে আছ কোথা
সরাও সখি, সরাও যবনিকা।

আবছায়াতে লুকিয়ে থেকে থেকে
সবার চোখে বেড়াও দেখে দেখে
সবার সুরে আমায় ডেকে ডেকে
ভোলাও শুধু নিপুণ চতুরিকা।

ভুলছি আমি দুলছি নানা দোলায়
বাসছি ভাল নূতন ক'রে রোজই
কিন্তু সখি এরই মধ্যে জেনো
মনে মনে চলছে তোমার খোঁজই
ভুলি নি তো সেই কত কাল আগে
রাঙিয়েছিলে আমায় রাঙা ফাগে
যদিও আজ স্বপন সম লাগে
রক্ত-রঙে মর্মে আছে লিখা।
সরাও সখি, সরাও যবনিকা।

একটা আমগাছের ডালে পরগাছা হয়েছিল। লাল লাল তার পাতা। সেইটে কবির চোখে পড়ল হঠাৎ। উৎসুক উন্মুখ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই দিকে, মনে হ'ল, আকাঙ্ক্ষিতাকে পাওয়া যাবে বুঝি ওই বর্ণোৎসবের মাঝখানে।

ওদিকে কি দেখছেন, এই দিকে আসুন। পাখিটা উড়ে গিয়ে আবার কাঁঠালগাছটায় বসেছে। এইবার দেখা যাবে বোধ হয়।··· দেখুন দেখুন দেখুন, দেখতে পেলেন ?"

এক ঝাঁক ছোট্ট পাখি উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে বসল দূরেব আমগাছটায়।

"মিনিভেট।"—উদ্ভাসিত মুখে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। তারপর ঘাসের উপরেই ব'সে পড়লেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। কবির দিকে আবার ফিরে চাইলেন। দৃষ্টি উৎফুল্ল।

"মিনিভেট! বাংলা নাম সয়ালী, এগুলো ছোট সয়ালী। অনেক-গুলো এসে বসেছে, দেখতে পাবেন এখনই। ওই গাছটার ওপরই ফোকাস করুন। উড়লেই দেখবেন পেটের নীচে ডানার নীচে টুকটুকে লাল। পিঠের ওপরটা কালচে গোছের, মানে—গ্রেইশ ব্রাউন, দেখুন ভাল ক'রে।"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে আমগাছের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন।

"দেখেছি। বাঃ, চমৎকার তো! কি নাম বললেন?"

"সাত সয়ালী।"

"পছন্দ হ'ল না, আমি ওর নাম দিচ্ছি আলতা-পরী—"

কবি আবার চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "চলুন, এবার বারবেটটাকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।"

দুজনে এগুলেন আবার কাঁঠালগাছের দিকে।

কবি গুনগুন করছিলেন মনে মনে—

শীতের মাসে গোপন পথে
আসলো কি ফাগুন
ডালিম-ফুলী আলতা-পরী
ছাই-চাপা আগুন।

"ব'সে পড়ুন ওইখানে। ওই তালগাছটার দিকে কাঁঠালগাছের যে ডালটা বেঁকে রয়েছে, ওইখানে ব'সে আছে বসন্ত-বউরি। ভারি অস্থির পাখি—ওই জায়গাটায় ফোকাস ক'রে থাকুন, দেখতে পাবেন।"

বসবার স্থানটা অবশ্য ভাল ছিল না। বড্ড ঢালু। বাঁ দিকে খেজুর-গাছের ঝোপ একটা, বৈজ্ঞানিক নির্বিকারচিত্তে তার পাশেই ব'সে পড়েছিলেন। দামী প্যাণ্টটা যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল ছিল না। কবিরও মনে বিকার নেই, কিন্তু বসবার সুবিধা পেলেন না

ব'লেই দাঁড়িয়ে দূরবীন লাগালেন চোখে। পাখিটা উড়ে গেল। বৈজ্ঞানিক চ'টে উঠলেন।

"বলছি, ব'সে পড়ুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভয়ানক চালাক পাখি, কেউ দেখছে ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে তক্ষুনি উড়ে পালাবে। আবার গিয়ে ইউক্যালিপ্টাস গাছটায় বসল। চলুন, আবার যেতে হবে অনেকটা।"

চলতে লাগলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, এই ফাঁকে কবিকে মিনিভেট সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করলে সময়টা কাটবে।

বললেন, "দেখুন, ওই যে মিনিভেটগুলো দেখলেন, ওগুলোর মেয়ে আর পুরুষ কিন্তু একরকম নয়। পুরুষদের যেমন ডানা আর পেটের নীচে লাল, মেয়েদের তেমনই আবার হলদে।"

কবি উত্তর দিলেন, "আমার কারবার পাখির রূপ নিয়ে, মেয়ে পুরুষ নিয়ে নয়। ব্যাকরণ নিয়ে আমি তত মাথা ঘামাই না। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে আমি বলব—

আলতা-পরী আলতা-পরী
রঙ্গনিপুণ রঙ্গিণী
সঙ্গে ক'রে বেড়াও নিয়ে
বাসন্তী-রঙ সঙ্গিনী।"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন, কবিও হাসলেন। ইউক্যালিপ্টাস গাছের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তাঁরা।

"চমৎকার দেখা যাচ্ছে এইবার। লাগান, লাগান, দূরবীন লাগান, বাঃ!"

কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখতে পেলেন এইবার।

"দেখেছি। বারবেট? উঁহু, ভাল নাম তো নয়। তবে একে পরীও ঠিক বলা চলে না। অনেকটা চক্রবর্তী-চক্রবর্তী ভাব। ওর

উচ্ছ্বসিত স্বর শুনলে মনে হয়, কোনও কলস্বরা কিশোরী বুঝি। তবে রঙ আছে গায়ে। পিঠটা সবুজ, মাথাটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না—হ্যাঁ, দেখেছি এইবার, তামাটে। আবার ঘুরে বসল, বুকটা দেখা যাচ্ছে, মাথারই মত প্রায়। চোখে হলুদ চশমা, ঠোঁটও হলদে···উড়ে পালাল···"

বাহিরে প্রবীণ চক্রবর্তী
অন্তরে তুমি কিশোরী কলস্বরা
গানের তুবড়ি আকাশে ছোটাও
সুরের ফুলকি ওড়ে গিটকিরি-ভরা
উৎসের মত শূন্যে ছড়ায়ে পড়ে
সবুজ পুচ্ছ পাতার আড়ালে নড়ে।

হলুদ রঙের চশমা দেখিয়া চোখে
কে বুঝিবে তুমি চঞ্চলা চতুরিকা
মর্ত্যে থাকিয়া বিহর স্বর্গলোকে
অন্তর ভরি সুর-স্বপনের শিখা
অতি অপরূপ ছদ্মবেশের তলে
ঊর্ধ্বমুখেতে রঙিন আলোতে জ্বলে।

কবি কবিতা ভাঁজছিলেন মনে মনে, আর বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছিলেন, "এই বারবেটগুলো কোথায় বাসা বাঁধে জানেন তো? গাছের ডালে গর্ত ক'রে। ওদের গায়ে অত রঙ, ডিমগুলো কিন্তু সাদা হয়··· ওই দেখুন দেখুন দেখুন—"

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক হলুদ রঙের পাখি উড়ে গেল।

"বান্‌টিং—"

"বাংলা নাম কি?"—কবি জিজ্ঞেস করলেন।

"জানা নেই। শীতকালে এরা এ দেশে আসে দলে দলে। ধানক্ষেতে জোয়ারিক্ষেতে বাজরাক্ষেতে দলে দলে নামে। খুব ফসল নষ্ট করে এরা। কিন্তু চমৎকার দেখতে। গাছপালার ওপর যখন দল বেঁধে

বসে, তখন সবুজের মাঝখানে হলুদের সে যে কি অদ্ভুত শোভা হয়! এদের দুটো জাত সাধারণত দেখা যায়, এক জাতের মাথাটা কালো আর এক জাতের মাথাটা লাল, বুঝলেন, কিন্তু এদের সোনার মত হলুদ রঙটাই এদের বৈশিষ্ট্য। ছোট পাখি, আমাদের চড়ুইপাখির মত।"

কবি বললেন, "এরাই সোনাপাখি নয় তো? ঠাকুরমার কাছে ছড়া শুনতাম—

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়লো
বর্গী এল দেশে
সোনাপাখিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।

ঠিক বলেছেন, এরা সোনাপাখিই।"

বৈজ্ঞানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্ষণকালের জন্য, এবং তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাইলেন একবার কবির মুখের দিকে।

"তা হতে পারে, ঠিক বলেছেন। ওই দেখুন, আর একদল উড়ে যাচ্ছে, সেই দলটাই বোধ হয়।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সোনার মেঘ উড়ে যাচ্ছে যেন একটা।

সোনার স্বপন নামছে নাকি
মর্ত্যভূমে
তাই কি ধরা অর্ঘ্য সাজায়
সবুজ ধানে যব-গোধূমে
নীল আকাশে আত্মহারা তাই কি রবি,
তাই কি জাগে কবির চোখে রূপের ছবি
গাছের ডগায় নদীর চড়ায়
মায়ের মুখের মধুর ছড়ায়
শিশুর ঘুমে?

"চমৎকার, না ?"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

কবি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সোনার মেঘ উড়ে চ'লে গেল দৃষ্টির ওপারে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওদের ডিমও খুব সুন্দর শুনেছি। ফিকে সবুজ রঙের, মিউজিয়মে দেখেছি একবার।"—এই পর্যন্ত ব'লে বৈজ্ঞানিকের খেয়াল হ'ল, "রূপচাঁদকে তো দেখছি না! কোথা গেল সে ?"

এদিক ওদিক চেয়ে কবি বললেন, "তাই তো কোথা গেল!"

"চলুন দেখি!"

দুজনে বেরুলেন রূপচাঁদের খোঁজে।

"ওগুলোকে চেনেন নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, ছাতারে"

"হিন্দী নাম কাচবাচিয়া, কেউ কেউ সাতভাইও বলে, কিন্তু যে বকম কচবচ করে সর্বদা, ইংরেজী সেভেন সিস্টার্স নামটাই বেশি লাগসই ব'লে মনে হয়, কি বলেন ? কিন্তু ভারি মিল আছে ওদের নিজেদের মধ্যে, বাজে ছোঁ মেরে যদি নিয়ে যায় একটাকে, বাকিগুলো পালিয়ে যায় না, বাজের পিছু পিছু ছোটে, অনেক সময় ছাড়িয়েও আনে। এমনও দেখা গেছে যে, ওদের দলকে যখন খাঁচার মধ্যে বন্দী ক'রে রাখা যায়, তখন একটাকে ছেড়ে দিলে সেটা আবার ফিরে আসে খাঁচাব মধ্যে। পরস্পর খুব ভাব, দুপুরে গাছতলায় দেখবেন, এ ওর মাথা খুঁটে দিচ্ছে। এদের নিয়ে আপনারা কবিতা লেখেন না, কিন্তু যাদের নিয়ে লেখেন, তাদের সঙ্গে এদের খুব নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, চাতক আর বউ-কথা-কও তেমনিই ডিম পাড়ে এদের বাসায়। এদের ডিম দেখলে কিন্তু কবিত্ব জাগবে আপনার মনে। পাখির ডিম নিয়ে আমি যে প্রবন্ধটা ফেঁদেছি, তাতে—দেখুন দেখুন, একটা ফড়িং ধরেছে। পোকা খুব খায়, ফল পেলেও ছাড়ে না—"

বৈজ্ঞানিক ছাতারে প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে চলেছিলেন। কবির মনে কিন্তু একটি কথাই কেবল আটকে গিয়েছিল, ওদের মধ্যে ভারি ভাব এবং এইটেকেই কেন্দ্র ক'রে মনের মধ্যে গুনগুন করছিল দুটো লাইন—

নিজেদের মাঝে এত স্নেহ আছে নাকি
ধরার ধূলার ধূসরবরণ পাখি ?

হঠাৎ রূপচাঁদকে দূরে গেল দেখা।

একা নয়, সঙ্গে একটি মেয়েও রয়েছে। আর একটু কাছে আসতে দেখা গেল, মেয়েটি তরুণী। আরও একটু কাছে গিয়ে নজরে পড়ল, একটা ঘড়া বসানো রয়েছে মাটিতে।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি ?"

স্মিতমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রূপচাঁদ উত্তর দিলেন, "রস"

"কি রস ?"

"মধুর"

তারপর আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে বললেন, "জিবেন কাটের খেজুর-রস। সব যোগাড় ক'রে তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম। পেয়ালা তিনটে গেল কোথায় ?"

দেখা গেল, এই বনের মধ্যে রূপচাঁদ তিনটে কাচের পেয়ালাও যোগাড় করেছেন।

মেয়েটির দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আপনিই পরিবেশন করুন তা হ'লে।"

মেয়েটি খুব সপ্রতিভভাবে মাথা নেড়ে ঘড়া থেকে রস ঢালতে লাগল পেয়ালায়। বৈজ্ঞানিক চোখে দূরবীন লাগিয়ে কি যেন একটা দেখছিলেন, এসব দিকে লক্ষ্যই ছিল না তাঁর। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অপরিচিতা মেয়েটির দিকে। লাবণ্যময়ী তরুণী।

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
রঙিন স্বপনলোকে মন যেন ঘুরে মরে
ঘুরে ঘুরে বারে বারে কারে চায় !

রঙ জাগে ফুলে ফুলে প্রভাতের আলোকে
রঙ জাগে পাখিদের পালকে
আকাশের নীলে আর মাঠ ভরা সবুজে
রঙের তুফান জাগে,—তবু যে

কিছুতে ভরে না মন, আরও চাই আরও চাই—
বাকি যেন আছে কিছু কি যেন কি মেলে নাই
তাই কি উঠিল ফুটি রূপসীর আঁখি দুটি
শ্যামল বনের পটভূমিকায় !

শীতের সোনালি রোদে জেগেছে স্বপনপুরী
লেগেছে রঙের নেশা চোখে হায়,
কি যেন কি পাই নাই কি যেন কি বাকি আছে
ঘুরে ফিরে বারে বারে মন গায় !

"নিন"

কবি আত্মস্থ হলেন। দেখলেন ফেনায়িত রসের পেয়ালা তুলে ধরেছে সে। কবির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "খুঁজতে বেরিয়েছিলাম পাখি, পেয়ে গেলাম সাকী।"

মেয়েটি হাসলে একটু—ম্লান বিষণ্ণ হাসি, কবির মনে হ'ল। বৈজ্ঞানিক চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, "বাঃ, সাদা-পেট ফিঙে দেখেছি একটা। দেখবেন ? ওই দূরের আমগাছটায় নীচু ডালে ব'সে আছে, ওদিকে নয়, এই দিকে, চলুন, আর একটু

এগিয়ে যাওয়া যাক বরং, এখান থেকে দেখতে পাবেন না আপনি, চলুন।"

"রসটা খেয়ে যান।"

"ও, ধন্যবাদ—দিন।"

এক নিশ্বাসে ঢকঢক ক'রে রসটা খেয়ে ফেললেন বৈজ্ঞানিক। পেয়ালাটা মাটিতে নামিয়ে কবির দিকে চেয়ে বললেন, "চলুন, সাদা-পেট ফিঙে চট ক'রে দেখা যায় না। রূপচাঁদ, যাবে নাকি?"

রূপচাঁদ একটি গাছের গুঁড়ির উপরে ব'সে তারিয়ে তারিয়ে চুমুকে চুমুকে রস খাচ্ছিলেন। বললেন, "তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি।"

## ২

বৈজ্ঞানিকের নাম অমরেশ সেনগুপ্ত। বৈজ্ঞানিক হবার যোগ্যতা আছে, সুযোগও ঘটেছে। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, ধনী শ্বশুরের একমাত্র জামাই। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রীও আছে একটা—জীব-বিদ্যা বিষয়ে। সাধারণ লোক হ'লে চাকরি করতেন। অমরেশের পক্ষে চাকরি যোগাড় করা শক্তও হ'ত না খুব। অমরেশ কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তি। চাকরির ঘানিতে ঘুরে বাঁধা-মাপের বরাদ্দ জ্ঞান-তৈলটুকু নিষ্কাশন ক'রে তৃপ্ত থাকবার মত মন তাঁর নয়। প্রকৃতির বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। জ্ঞান আহরণ করতে চান। উৎসুক উৎকর্ণ আছেন সর্বদা। থাকা সম্ভব হয়েছে, কারণ অর্থাভাব নেই। পিতৃকুল শ্বশুরকুল—উভয়কুল থেকেই তাঁর তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ এসে জুটেছে, তা অনায়াসেই অনর্থ সৃষ্টি করতে পারত, যদি অমরেশ সাধারণ লোক হ'তেন। তিনি যা করতে চাইছেন, তা-ও অবশ্য সনাতন মল্লিকের মতে অনর্থক। তিনি মফস্বলে নিজেদের জমিদারিতে একটা

চিড়িয়াখানা বানাতে চান। তাতে জীবিত এবং মৃত নানারকম পাখি থাকবে। তাঁর ধারণা, এ দেশে পক্ষীবিষয়ে সম্যক গবেষণা এখনও হয় নি। বিদেশী সাহেবেরা চাকরি করবার ফাঁকে ফাঁকে যিনি যতটুকু পেরেছেন ক'রে গেছেন। উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও অনেক কিছু করা দরকার। এমন অনেক ছোট পাখি তিনি দেখতে পাচ্ছেন, যাদের শ্রেণী ঠিকমত নির্দিষ্ট হয় নি এখনও। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি সম্বন্ধেও সব তথ্য পুরো জানা যায় নি ব'লে তাঁর বিশ্বাস। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, এই সব বিষয়ে আলোকপাত করবেন। পাখিদের নূতন নূতন শ্রেণী আবিষ্কার করবেন তাদের ঠোঁট, পালকসংখ্যা, পায়ের গড়ন প্রভৃতি থেকে। কলকাতা থেকে সম্প্রতি এসে পারি-পার্শ্বিকটা কেবল পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি আজকাল। ঠিক কোন্ রাস্তাটা ধরবেন ঠিক হয় নি এখনও, মাথার মধ্যে নব নব প্রেরণা ভিড় করছে কেবল। আর একটা সুবিধে হয়েছে—ছেলেপিলে হয় নি। তৃতীয় সুবিধে—স্ত্রী রত্নপ্রভাও অসাধারণ মহিলা। অত্যন্ত কুৎসিত। কালো রঙ, বলিষ্ঠ গঠন। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ফজলি আম। খুব কম কথা বলে। চোখ দুটি বেশ বড় বড়। সেই চোখ দুটি কখনও কুঞ্চিত কখনও বিস্ফারিত ক'রে মনোভাব প্রকাশ করে সে। কথা ক্বচিৎ বলে। যখন বলে, তখনও শোনা যায় না ভাল ক'রে। কণ্ঠস্বর ধরা, ভাঙা ভাঙা। মনে হয়, সর্দি হয়েছে। লেখাপড়া জানে না বিশেষ। অমরেশের কার্যকলাপ নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে সে। খামখেয়ালী দামাল ছেলের দুরন্তপনা উপভোগ করেন যেমন স্নেহময়ী জননী, রত্নপ্রভাও তেমনই উপভোগ করে উদ্দামপ্রকৃতি স্বামীর শিশুসুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু নীরবে। কথার কলরবে বা কচকচিতে অমরেশের শান্তি বিঘ্নিত করে না কখনও। নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সে খুবই সচেতন। অমরেশের মত বিদ্বান রূপবান স্বামীর সহধর্মিণী হবার মত কি-ই বা তার আছে! সে কেবল প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে চলেছে, অমরেশের যাতে কোনও রকম কষ্ট না হয়। খাবার, বিছানা, বই, যন্ত্রপাতি, পাখিগুলি, এই সবের

সুনিপুণ তদারক ক'রে অমরেশের খামখেয়ালী ছন্নছাড়া জীবনকে কথঞ্চিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রয়াস পায় সে। ক্রীতদাসীর মত সেবা করে। কিন্তু বাইরে থেকে ঘুণাক্ষরে বুঝতে দেয় না যে, সে ক্রীতদাসী তার কালো কালো মাংসল মুখখানি দেখলে মনে হয়, খুব গম্ভীর রাশ-ভারী লোক সে। সে যে মনে মনে অত কুণ্ঠিত ভীরু, বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। অমরেশও মনে মনে তাকে ভয় করেন। শুধু তাই নয়, রত্নপ্রভার বুদ্ধি যে তাঁর চেয়ে অনেক কম, এ কথা অমরেশ যেন মানেনই না মনে হয়। পক্ষীতত্ত্ববিষয়ক নানা বক্তৃতা অসঙ্কোচে তিনি ক'রে যান রত্নপ্রভার কাছে। রত্নপ্রভাও গম্ভীরমুখে শোনে ব'সে ব'সে। সেদিন যেমন হচ্ছিল। রত্নপ্রভা গম্ভীরমুখে ব'সে সুপুরি কুচিয়ে যাচ্ছিল, আর অমরেশ ব'লে চলেছিলেন অনর্গল।

"দেখ, ভাবছি, আরও কতকগুলো রেডস্টার্ট ধরব। ধ'রে তাদের পায়ে ছোট ছোট লোহার রিঙ পরিয়ে দেব। ওদেশে আজকাল অ্যালুমিনিয়মের রিঙ পরায়, কিন্তু এখানে তো তা পাওয়া যাবে না। লোহার রিঙই পরাব। দোয়েলগুলোর পায়ে যেমন পরিয়েছিলাম। রেডস্টার্টগুলোর পায়েও পরাতে হবে। কেন বুঝতে পেরেছ ?"

রত্নপ্রভা বললে, "তুমি যে দোয়েল পাখির জীবনচরিত লিখবে বলেছিলে, তার কি হ'ল ?"

অমরেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন ক্ষণকালেব জন্য। আমাদেব দেশী পাখিদের জীবনের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ক'রে তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে তাঁর। দোয়েল নিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাধনাটাকে কিছুতেই একাগ্র রাখতে পারছেন না এবং এজন্য নিজেই তিনি মনে মনে সচেতন হয়ে আছেন। রত্নপ্রভাও সেটা লক্ষ্য করেছে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি। স্কুলের ছেলেরা পড়ায় অবহেলা ক'রে শিক্ষকের কাছে যেমন নানা ছুতো দেখায়, অমরেশের উত্তরটা অনেকটা সেইরকম শোনাল।

"শীতকালে দোয়েল পাখির দেখাই পাচ্ছি না যে। ডাক পর্যন্ত

শোনা যায় না। মাঝে মাঝে দেখতে পাই এক-আধ বার। যখন যতটুকু দেখছি, টুকে রাখছি। শীতকালে উইন্‌টার ভিজিটারদের নিয়ে আলোচনা করলে ক্ষতি কি! কি বল?”

ধরাগলায় রত্নপ্রভা বললে, “তা বেশ তো”—ব’লে গম্ভীরভাবে সুপুরি কুচিয়ে যেতে লাগল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আবার বৈজ্ঞানিক,—“এই রেডস্টার্টগুলো থাকে হিমালয়-অঞ্চলে। শীতকালে এই দিকে চ’লে আসে। এখানে ওদের ধ’রে যদি পায়ে রিঙ পরিয়ে দেওয়া যায়, তা হ’লে ওরা যখন আবার হিমালয়ে ফিরে যাবে, তখন চেনা যাবে ওদের তখন যদি আমরা ও অঞ্চলে যাই, কিংবা কোন লোক রাখি ওদের লক্ষ্য করবার জন্যে। তা হ’লে বোঝা যাবে, ওরা ঠিক কখন ফেরে, এ দেশ থেকে ও দেশে যেতে ওদের কত সময় লাগে। এই টাইম ফ্যাক্‌টারটা খুব দরকারি, বুঝলে? তারপর জানতে হবে, কেন ওরা ফেরে! হিমালয় থেকে অবশ্য পালিয়ে আসে শীতের চোটে। শীতকালে খাদ্যাভাবও ঘটে। কিন্তু ডিম পাড়বার জন্যে সেখানে আবার ফেরে কেন? এ হতে পারে, গরম দেশে ওদের ডিম ফোটে না ভাল ক’রে। আমাদের দীঘিচকের কাছে যে বিঘে দশেক বাগানটা আছে, হরিশবাবু সেটা বন্দোবস্ত নিতে চাইছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, দেব না। ওটা সমস্তটা জাল দিয়ে ঘিরে ওর মধ্যে শতখানেক রেডস্টার্ট আটকে রাখতে চাই। দেখি, ওরা এ দেশে ডিম পাড়ে কি না! বুঝলে, করব কি, খানিকটা ছ’কে রেখেছি, এই দেখ।”—প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বার ক’রে রত্নপ্রভাকে বোঝাতে লাগলেন তিনি, কি ভাবে বাগানটাকে ঘিরতে হবে। রত্নপ্রভাও এমন গম্ভীরভাবে ঝুঁকে দেখতে লাগল, যেন সে বড় ইঞ্জিনীয়ার একজন।

বাইরে ডাক শোনা গেল, “অমরবাবু বাড়ি আছেন?”—

কবির কণ্ঠস্বর।

“কে, আনন্দবাবু নাকি? আসুন, ভেতরে আসুন।”

সুপুরির সরঞ্জাম নিয়ে রত্নপ্রভা অন্তঃপুরের দিকে চ'লে গেল।

কবি ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বারান্দায়।

"আরে মশাই, এ কি রক্তারক্তি কাণ্ড! ছি ছি, করেছেন কি!"

বেরিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"ও, ওটা একটা রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট করেছি।

"কেন?"

"দেখতে চাই, ওর সেক্স অর্গ্যান্‌স ঠিক পরিপুষ্ট হয়েছে কি না!"

"তা দেখবারই বা দরকার কি?"

"তা হ'লে অনেক কথা বলতে হয়। ভেতরে আসুন।"

"আহা, অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে কি করেছেন বলুন দেখি? কি নাম বললেন?"

"রেডস্টার্ট—হিন্দী নাম থিরথিরা। ল্যাজটা ওর থরথর ক'রে কাঁপে সাইড টু সাইড। সাধারণত পাখিরা ল্যাজ ওপরের দিকে খাড়া ক'রে তোলে, যেমন দোয়েল—এদের ল্যাজ পাশাপাশি কাঁপে। তাছাড়া এরা বুক-ডন দেয় এমন সুন্দব—"

"কিন্তু ওর লিঙ্গ নিয়ে অত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন আপনি?"

"বলছি, বসুন না।"

দুজনে ঘরের মধ্যে এসে বসলেন।

শুরু করলেন অমরবাবু।

"পাখিরা এক দেশ থেকে আব এক দেশে যায়, জানেন তো! হিমালয় থেকে এ দেশে অনেক পাখি চ'লে আসে শীতকালে। আবার শীত শেষ হ'লে তারা ফিরে যায় হিমালয়ে, সেইখানেই তাদের জন্মভূমি। সেইখানে গিয়েই তারা বাসা করে, ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়। শীতের দেশের পাখি এ দেশে কক্‌খনও ডিম পাড়ে না, এই একটা মজা। ডিম পাড়বার সময় হ'লে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে আবার স্বদেশে ফিরে যায় সব। কেন ফিরে যায়, কি ক'রে ফিরে যায়, এটা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা মস্ত গবেষণার বিষয়। গড্‌উইন

ব'লে এক পাগলা বিশপের অদ্ভুত ধারণা ছিল, তিনি বলতেন যে পাখিরা চাঁদে যায়। গিল্‌বার্ট হোয়াইটের মত বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করতেন যে, শীতকালে সো আলোরা পুকুরে কাদার নীচে চ'লে যায়। এসব কথা কিন্তু বিশ্বাস করে না কেউ আজকাল। আজকালকার থিয়োরি হচ্ছে যে পাখিরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায় তার কারণ পাখির ভিতরে এবং বাইরে দু জায়গাতেই আছে। দিন যত বড় হতে থাকে পাখিদের গায়ে আলো তত বেশি লাগে। সেই আলোর প্রভাবে তাদের সেক্স্ অর্গ্যান্‌স পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তারা স্বদেশে ফিরে যায়। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে যে স্টেরাইল পাখিদের ফিরে যাবার তাগিদ থাকে না। এ-ও দেখা গেছে যে, যখন তারা শীতের দেশ থেকে এ দেশে আসে, তখন তাদের সেক্স্ অর্গ্যান্‌স খুবই অপরিপুষ্ট, তারপর কিছুদিন তাদের এভিয়ারিতে কৃত্রিম আলোতে রেখে এবং আলোর পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রমাণ করেছেন একজন যে, তাদেব সেক্স্ অর্গ্যান্‌স পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। এরও অবশ্য নানা ব্যতিক্রম দেখা গেছে পরে, আমি তাই দেখছিলাম যে, এই রেডস্টার্টটার সেক্স্ অর্গ্যান্‌স কি রকম। কয়েকটা রেডস্টার্ট ধরেওছি, তাদের আল্‌ট্রা-ভায়োলেটে এক্‌স্‌পোজ ক'রে দেখব কি দাঁড়ায়।"

"কি দাঁড়ায় তা তো একজন বৈজ্ঞানিক দেখেছেন বললেন, আবার কেন?"

"বিজ্ঞানে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। প্রত্যেক জিনিসটি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়—"

বৈজ্ঞানিক স্মিতমুখে চাইলেন কবির দিকে।

"পরীক্ষা ক'রে জানতে চান, এক-জাতের পাখি শীতকালে আর এক দেশে যায় কেন?"

"হ্যাঁ"

"সেইজন্যে অমন সুন্দর পাখিটাকে কেটে ছিঁড়ে একাকার করেছেন?"

"নিশ্চয়। তাতে ক্ষতি কি ?"

"আমি জানি, কেন যায়"

"জানেন ?"

কৌতূহলভরে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি।

"কেন, বলুন তো ?"

"টানে"

"টানে ? হোয়াট ডু ইউ মীন ? কিসের টানে ?"

"প্রাণের টানে। অনবরত টানাটানি চলছে, দেখতে পাচ্ছেন না ? শুধু পাখি কেন, যখন যেদিকে বেশি টান পড়ে, তখন সেই দিকে সবাই চ'লে যাই আমরা। চেয়ে দেখুন, বিশ্ব জুড়ে অবিরাম এই টানাটানি চলেছে। দিন।"

"কি ?"

"কাগজ পেন্সিল"

"কি হবে ?"

"দিন না"

কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন কবি। বৈজ্ঞানিক বেরিয়ে গেলেন তাঁর ব্যবচ্ছেদিত রেডস্টার্টটার তদারক করতে। অনেক কিছু করতে হবে তাঁকে এখন। ওভারি দুটোকে ফ্রিজ্ ক'রে মাইক্রোটোম দিয়ে কেটে মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে। সেগুলোর ফোটো তুলে রাখতে হবে। তা ছাড়া দুটো ছোট ছোট ঘরে দু দল রেডস্টার্ট রেখেছেন, এক দলকে রেখেছেন অন্ধকারে, আর এক দলকে আলট্রা-ভায়োলেট আলোর মধ্যে। সেগুলার খবর নিতে হবে একবার। পাখিগুলোকে খেতে দিয়েছে কি না, কে জানে! চাকরগুলো মাইনে নেয় একগাদা কিন্তু কাজ কিছু করে না। প্রথমত জানে না, দ্বিতীয়ত জানতে চায় না। ভারি ফাঁকিবাজ সব। মুন্সিটা পাখির খাবার এনেছে কি না তারও ঠিক নেই। বীট্‌ল্ সেদিন চিনিয়ে দিয়েছেন তাকে। রেডস্টার্টগুলো বীট্‌ল্ খেতে খুব ভালবাসে। গুটিপোকাও খুব খায়।
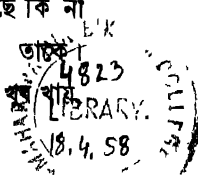
ফড়িং হ'লেও চলে, নিদেনপক্ষে পিঁপড়ে। কিন্তু খুঁজে আনে তবে তো…। এই দেশে পাখি পোষার এই এক মহাঝঞ্ঝাট, বাজারে পয়সা ফেললে তাদের খাবার কিনতে পাওয়া যায় না। ও দেশে যায়। এ দেশে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে, ছাতু খাওয়ান। আশ্চর্য এদের বুদ্ধি! পাখি কি মানুষ যে, ছাতু খাবে!

হনহন ক'রে গেলেন তিনি বাগানের পিছন দিকটায়। সেখানে তক্তা, কাচ, লোহার জাল, সুতোর জাল, তাঁবু প্রভৃতি নানা সরঞ্জামের সহায়তায় বাগানের দুটো অংশ গাছপালা সমেত ঢেকে বিরাট দুটো খাঁচায় পরিণত করেছেন। অন্ধকারের ভিতর যে রেডস্টার্টগুলোকে রেখেছেন, সেখানটা সম্পূর্ণ ঢাকা আছে প্রকাণ্ড একটা তাঁবুতে। তার ভিতর কম-পাওয়ারের একটা ইলেকট্রিক লাইট আছে, খাবার দেওয়ার সময় সেটা জ্বালা হয় কেবল। সেইখানটায় গেলেন তিনি আগে। কান পেতে রইলেন তাঁবুর বাইরে। অতি সন্তর্পণে। বাসর-ঘরেও অত সন্তর্পণে লোকে আড়ি পাতে না। 'হুইট…হুইট…হুইট…' ওই যে ডাকছে! বড় করুণ ব'লে মনে হ'ল। খেতে পায় নি নাকি? আহা, কোন্ সুদূর থেকে এসেছে বেচারারা, কাশ্মীর-অঞ্চলে হিমালয়ের কাছে বাড়ি ওদের…বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠুর কৌতূহল করুণার্দ্র হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, পাখির ডাক জিনিসটা অদ্ভুত, ভাবি অদ্ভুত! আমাদের কথা দিয়ে কিছুতে প্রকাশ করা যায় না তা। 'কুহু' বললেই কি কোকিলের কলকণ্ঠের সবটা বোঝানো যায়? রেডস্টার্টের দুটো 'হুইট'এর মাঝখানে ওই যে কেমন একটু শব্দ আছে, যা তৈলহীন সাইকেলের চাকার শব্দের মত অনেকটা, তা ভাষায় কিছুতেই লেখা যায় না। একই পাখির একই ডাককে আমরা বলছি 'চোখ গেল', সাহেবরা বলছে 'ব্রেন ফিভার', বেহারীরা বলে 'পিউ কাঁহা', মারহাট্টীরা 'পাওসালা'। অথচ ডাক একই। আচ্ছা, এদের গলার স্বরের গ্রাফ রাখলে কেমন হয়?… অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। গ্রাফের কথাই ভাবতে লাগলেন।

পাখিগুলোকে ধ'রে ধ'রে ফোনোগ্রাফের মত কোন যন্ত্রের সামনে যদি রাখা যায়, কিন্তু তা হ'লে তারা ডাকবে কি? মনের আনন্দে ওরা ডাকে, ধর-পাকড় করলে ডাকবে না বোধ হয়, অবশ্য চেষ্টা করলে ক্ষতি নেই। খুট ক'রে শব্দ হতেই বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, মুন্সি দাঁড়িয়ে আছে।

"কি রে, পাখিদের খাইয়েছিস ?"

"হাঁ বাবু, কিন্তু কাল থেকে আমি আর পারব না হুজুর। মল্লিকবাবু আজ আমাকে মারবার জন্যে তেড়ে এসেছিলেন। তাঁর বাগানে আমি আর ঢুকব না।"

"তাঁর বাগানে যাস কেন? আমাদের নিজেদের অত বড় বাগান রয়েছে—"

"আমাদের বাগানে ছোট ছোট ফড়িং কই ?"

"নেই ?"

"না"

হঠাৎ সমস্যাটা খুব জটিল ব'লে মনে হ'ল তাঁর কাছে। তাঁব বাগানে ফড়িং নেই, অথচ মল্লিকবাবু ফড়িং ধবতে দেবেন না, পয়সা দিলে বাজারে ফড়িং পাওয়া যাবে না,...মহা মুশকিল তো! পাখিগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে নাকি শেষকালে? না, তাই বা কি ক'বে হয় ?..."

"আমাদের বাগানে ফড়িং নেই ?"

"দুটো চারটে—"

"খুঁজে দেখেছিস ভাল ক'বে ?"

"খুব খুঁজেছি হুজুর"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন বৈজ্ঞানিক। আড়চোখে চেয়ে স'রে পড়ল মুন্সি। খামখেয়ালী পাগল লোক হঠাৎ কখন কি ক'বে বসেন, বলা যায় না। অমরবাবু আর একবাব কান পেতে শুনলেন। 'হুইট—হুইট—হুইট'—ঠিক ডাকছে। মল্লিক লোকটাকে এখন কি ক'রে বাগানো যায়? লোকটার কেন যে এমন অকারণ রাগ, বোঝা

শক্ত। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়ীতে তাস-পাশার যে আড্ডা বসে, তাতে যোগ দেবার জন্যে দু-একদিন আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু অমরবাবু যান নি। অন্য কোন কারণে নয়, খেলতে পারেন না ব'লে যান নি। একটা কীর্তনের দল এসেছিল একদিন তাঁর বাড়ীতে, শুনতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেবারও যান নি। কীর্তন-টির্তন্ ভালই লাগে না মোটে। মনে হয়, মৃদঙ্গ বাজিয়ে অকারণে কতকগুলো লোক হুল্লোড় করছে গানের নাম ক'রে। এই সব কারণেই চটলেন নাকি ভদ্রলোক? হয়তো। অন্যায় কিন্তু—অত্যন্ত অন্যায়। তিনি কি চান, আমি পড়াশোনা পরিত্যাগ ক'রে ভাল না লাগলেও তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাস খেলব আর কীর্তন শুনব? তা না হ'লে আমার পাখির ফড়িং খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবেন? অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। এই ধরণের চিন্তা করতে করতে হনহন ক'রে ফিরছিলেন তিনি আবার এবং ক্রমাগত ভাবছিলেন, মল্লিক লোকটাকে কি ক'রে বাগানো যায়। নানারকম উপায়ের কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু যে মোক্ষম উপায়টি অবলম্বন করলে অবিলম্বে সব ঠিক হয়ে যায়, সেটি ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক তাঁরই কর্মচারী। তাঁদের হরিপুরা জমিদারীর ম্যানেজার তিনি। মুন্সি যে বাগানটায় ঢুকতে পায় নি, সেটা অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তিনি—মানে অমরবাবু নিজে যদি একটা চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ করতেন, তা হ'লে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তা লেখবার কল্পনাও করলেন না। মনিবত্বের সুযোগ নিয়ে মল্লিকের বাগানে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোক ঢুকিয়ে ফড়িং সংগ্রহ করবেন, এ তাঁর কল্পনাতীত। মল্লিকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কেবলই ভাবছিলেন, এ রকম করার অর্থটা কি। আমার এই গবেষণাটা যে ঠিক কি জাতীয়, তাই বোধ হয় ধারণা নেই ওঁর। উনি বোধ হয় ভাবছেন, ছেলেখেলা হচ্ছে একটা। পাখিদের এই বার্ষিক গতি-বিধি যে কত রহস্যময়, তা একদিন বুঝিয়ে বললে বোধ হয় আপত্তি করবেন না আর। পাখিরা যে কিসের টানে

এক দেশ থেকে আর এক দেশে চ'লে যায়, তা ঠিকমত নির্ণয় করতে পারলে বিজ্ঞান-জগতে হৈচৈ প'ড়ে যাবে একটা। এ নিয়ে পৃথিবীর কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামিয়ে সারা হচ্ছেন, কত লোক গবেষণা করবার সুযোগই পাচ্ছেন না, আর তিনি তাঁর বাগানে ফড়িং ধরতে দেবেন না, এ কি একটা কথা হ'ল! নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বোঝেন নি ভদ্রলোক। কিংবা মুন্সি হয়তো তাঁর বাগানের গাছে-টাছে হাত দিয়েছে। কিছুই বিচিত্র নয়···। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মল্লিক-প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন একেবারে। একটু দূরে ঘাসের উপর পালক প'ড়ে রয়েছে একটা। প্রায় ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন সেটাকে। দোয়েলেব পালক। সাদায় কালোয়—এই তো! অনেক বকম পাখির পালক সংগ্রহ করা আছে তাঁব, দোয়েলের পালক পান নি ইতিপূর্বে। তাঁব এই পালক-সংগ্রহটি একটু বিশেষ ধরণের সংগ্রহ। এতে যে সব পালক তিনি রেখেছেন, তা কুড়িয়ে-পাওয়া পালক। পাখি মেরে তার গা থেকে ছিঁড়ে আর এক ধবণেব সংগ্রহ আছে তাঁর—প্রাইমাবি সেকেণ্ডারি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ ক'রে। কিন্তু এই কুড়িয়ে-পাওয়া পালকের আকর্ষণ অন্য রকম, বিস্ময় আলাদা। নানা পাখিব ডিমও সংগ্রহ করেছেন তিনি, কিন্তু এই হঠাৎ-কুড়িয়ে-পাওয়া পালক তাঁকে যত আনন্দ দিয়েছে, তত আব কিছুতে পান নি তিনি। দোয়েলের পালক কুড়িয়ে পান নি তিনি ইতিপূর্বে। মনের আনন্দে ছুটলেন তিনি বাড়িব দিকে। রত্নাকে দেখাতে হবে। ফিরেই কিন্তু কবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কবি যে বৈঠকখানায় ব'সে আছেন, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি।

"শুনুন"

"কি ?"

"কবিতা। এক দেশ থেকে আর এক দেশে কেন নিরন্তর চলেছে এই যাওয়া-আসা, তারই কবিতা।"

"পড়ুন"

১

ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে !
তৃষিত ধরণী লক্ষ মুখেতে পান করে সেই আলোক-ধারা
লক্ষ ছন্দে গাহে আনন্দে আপনার মনে পাগলপারা
পাখির পালকে গাছের পাতায়
ঝলকে চমকে পুলকে ব্যথায়
আত্মহারা
অন্ধকারেতে জ্বালায় তারা।

কণায় কণায় তাহার তনুর
সপ্ত বরণ ইন্দ্রধনুর
বর্ণমালা
উজাড় করিয়া হয় যে ঢালা
কেন কে জানে,
ধূলি-ধূসরিত ধরার পানে
লক্ষ যোজন দূরের সূর্য
আলোক পাঠায় কিসের টানে !

২

জানি না আবার সূর্য পানে
লক্ষ যোজন দূরের পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে !

শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া ভঙ্গিমা তার কত যে ওঠে
বন-বনান্ত হয় মুখরিত নব নব কত সুরের চোটে
মাটির কালোয় প'ড়ে যায় সাড়া
বন্দী রঙেরা পেয়ে যায় ছাড়া
সবাই ছোটে
লক্ষ বরণ ফুলেতে ফোটে ;

মাটির মানুষ আকাশের দিকে
দু বাহু তুলিয়া রহে অনিমিখে
কি গান গাহে
কিসের আশায় কাহারে চাহে
কেন কে জানে
জ্বলন্ত-শিখা সূর্য পানে
স্নিগ্ধ শ্যামল কোমল পৃথিবী
অর্ঘ্য পাঠায় কিসের টানে !

কবিতা পাঠ ক'রে কবি চেয়ে রইলেন স্মিতমুখে।

বৈজ্ঞানিক কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে তিনি বললেন, "আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে কিন্তু।"

"কি ?"

"রবি ঠাকুরের টানে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর 'লিপি' কবিতাটার ভাব চুরি ক'রে ফেলেছি।"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওকে ঠিক চুরি বলে না। কবিতা খুব ভাল হয়েছে আপনার। একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন, কবিতা বিজ্ঞান নয়। আপনি যে টানের গানে উচ্ছ্বসিত, বৈজ্ঞানিকের কাজ সেই টানের কারণ নির্ণয় করা যুক্তি-সহ উপায়ে। সূর্য কেন পৃথিবীর দিকে আলো পাঠায় আর পৃথিবী থেকে আকাশে এত গান গন্ধ গুঞ্জন কেন

ওঠে, তার অনেক কারণ বিজ্ঞান বার করেছে, অনেকগুলোর পারেও নি। কিন্তু পারবে একদিন।"

বৈজ্ঞানিকের এই বালক-সুলভ আত্মপ্রত্যয়ে কবির মুখে একটা অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল। প্রতিবাদ করলেন না। কি হবে প্রতিবাদ ক'রে! তাঁর মনে শুধু গুনগুন ক'রে উঠল কবিতার ছুটো লাইন।—

কোন্ চতুরিকা কোন্ পথে আসি
ক'রে যায় কত ছলনা
তার কতটুকু জান বল না!

হয়তো ব্যঙ্গোক্তি করতেন একটা। কিন্তু বাধা পড়ে গেল তাতে। দ্বারপ্রান্তে গোটা তিনেক চাকবের আবির্ভাব হ'ল। ছুজনের হাত খাবারের সরঞ্জাম আর একজনের হাতে চায়ের। পিছনে রত্নপ্রভা। তিনি গম্ভীরভাবে ছুজনের সামনে খাবাব সাজিয়ে দিয়ে পাশের টেবিলটায় দাঁড়িয়ে চা ঢাঁকতে লাগলেন, মুখে একটি কথা নেই। ক্ষুধিত বালকের মত খেতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। ছুটো রসগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে সেগুলো গিলতে না গিলতেই একটা কচুরিতে লাগালেন কামড়। কবি এ সময়ে খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, এ সময়ে খাওয়া অভ্যাসও নয় তাঁর। কিন্তু এতগুলি রসবস্তুকে অবহেলা করলে রস-বোধেরই যেন অপমান করা হবে—এই ধরনের একটা মনোভাব নিয়ে অথচ শিল্পী-জনোচিত সাবধানতার সহিত তিনি অগ্রসর হলেন। রত্নপ্রভা ছুজনের সামনে চায়ের পেয়ালা রাখতেই বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল সহসা। চায়ের সঙ্গে ষ্টোভের এবং ষ্টোভের সঙ্গে কেরোসিন তেলের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগই সম্ভবত বিস্মৃতি-অপনোদনের কারণ হ'ল।

"যাঃ—ছি—ছি! কটা বেজেছে?"

চেয়ার ঠেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং রত্নপ্রভার দিকে চাইতে লাগলেন অপরাধী বালকের মত। বর্ধমানের বাইরে এমন সীতাভোগ কি ক'রে হওয়া সম্ভব—কবি চিন্তা করছিলেন, তাঁর চিন্তাধারা ছিন্ন হ'ল এতে।

"কি হ'ল আপনার আবার?"—একটু বিরক্তকণ্ঠেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

"কেরোসিনের পারমিটের জন্যে একটা লোক পাঠাবার কথা ছিল, ছি ছি, একদম ভুলে গেছি।"

"লোক পাঠিয়ে পারমিট আনিয়ে নিয়েছি আমি।"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভা বললেন।

"তাই নাকি? বাঃ! গোটাচারেক সিঙাড়া দাও তা হ'লে।"

কবিও ব'লে উঠলেন, "ওহো, আমিই বা করছি কি! আমার বাড়িতে কয়লা একেবারেই নেই। আজ উনুন ধরবে না, আপনার কাছে যদি পাওয়া যায় কিছু, এই আশায় বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে।"

বৈজ্ঞানিক রত্নপ্রভার দিকে চাইতেই রত্নপ্রভা বললেন, "আমাদের কিছু বেশী কয়লা আছে, আমি দিচ্ছি ব্যবস্থা ক'রে।"—ব'লেই বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

"আনন্দ আছ নাকি?"

"আছি, এস"

রূপচাঁদ মৌলিক প্রবেশ করলেন। গলায় পাকানো চাদর, বগলে একটি প্যাকেট। এসেই তিনি কবির দিকে এক নজর চেয়ে একটি চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, পাশের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রয়েছে। উঠে গিয়ে নিজেই এক কাপ চা ছেঁকে নিলেন। চায়ে একটা বড়গোছ চুমুক লাগিয়ে কবির দিকে আর এক নজর চেয়ে বললেন, "এরকম ভাবে কতদিন চালাবে বল দিকি আনন্দ?"

"কি রকম ভাবে ?"

"পরিবারকে উনুন-গোড়ায় বসিয়ে রেখে কয়লা আনতে যাচ্ছি ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ প্রায় ঘণ্টা দুই আগে, আর এখানে বসে দিব্যি রসগোল্লা ওড়াচ্ছ ! তোমার জ্বালায় আমি আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে পারি নি এখনও। পথেই তোমার ঝিয়ের সঙ্গে দেখা, সে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চে চতুর্দিকে। তার মুখেই শুনলুম সব।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ! গেলাম বৈজুমলের কাছে। মণ চারেক কয়লা পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। কয়লা নিয়ে ফিরে দেখি, তখনও তুমি ফেরো নি। তখন মনে হ'ল, নিশ্চয়ই পাখির খপ্পরে পড়েছ। বৈজ্ঞানিক মশায়ের সঙ্গে আমারও একটু দরকার আছে, তাই সোজা এখানেই চ'লে এলাম, এখনও বাড়ি ঢুকি নি।"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল শুধু। বস্তুত, কথা বলবার মত অবস্থা তখন তাঁর নয়। শেষ সিঙাড়াটি মুখে পুরে চর্বণ করছিলেন তিনি তখন। কবি স্মিতহাস্যে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ—তোমার কর্তব্য তুমি করেছ, এতে আর বলবার কি আছে !

"ছ'টাকা বারো আনা লেগেছে। ছ'টাকা কয়লার দাম আর বারো আনা কুলি। টাকাটা দিতে ভুলে যেও না। কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা, আমিই আনিয়ে নেব এখন তোমার গিন্নীর কাছ থেকে।"

খানিকটা চা দিয়ে মুখবিবরটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বৈজ্ঞানিক হাঁকলেন, "ওরে, কে আছিস ?"

একটা ছোঁড়া চাকর এসে দাঁড়াল।

"আর এক ডিশ খাবার নিয়ে আয়। বল্, রূপচাঁদবাবু এসেছেন।"

"কাজের কথাটা ব'লে নিই আগে"—শুরু করলেন রূপচাঁদ।

"কি কথা ?"

"সবজিবাগে নদীর ধারে তোমার যে বাড়িটা প'ড়ে আছে, সেটা দেবে আমাকে ?"

"সেটা তো প'ড়ো বাড়ি।"

"একখানা ঘর হ'লেই চলবে। সেই মেয়েটির জন্যে—"

"সে মেয়েটি আছে নাকি এখনও, কে বল তো মেয়েটি ?"—কবি ব'লে উঠলেন। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি।

"তা থাকতে পারেন তিনি, আপত্তি নেই। তবে—"

একটু ইতস্তত ক'রে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

"তবে আবার কি, খোলসা ক'রেই বল না! শহরের বাইরে তোমার ওই প'ড়ো বাড়িতে কারও পক্ষে থাকা এমনিতেই শক্ত, তবে মেয়েটি নেহাত নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে—ধর্মশালায় দু' দিনের বেশি তো থাকতে দেবে না!"

"প'ড়ো বাড়ি ব'লেই ওটা বেশি দরকারী আমার কাছে। ওর পাশেই যে বাঁশঝাড়টা আছে, তাতেই কেটুপা (Ketupa) দেখেছিলাম একদিন···ওখানে মাঝে মাঝে যাই আমি রাত্রিবেলা।"

"কেটুপা কি আবার ?"

"হুতুম প্যাঁচা"

রূপচাদ নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল বৈজ্ঞানিকের দিকে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক চিকমিক করতে লাগল কেবল।

তারপর বললেন, "বেশ তো, সে যখন দরকার তোমার, যেও।"

"উনি আপত্তি করবেন না তো তাতে ?"

"কিছুমাত্র না"

"মেয়েটি কে, কোথা থেকে এল ?"—কবি প্রশ্ন করলেন আবার।

রূপচাঁদ রহস্যময় দৃষ্টি মেলে চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "বার্মা রেফিউজি।"

বৈজ্ঞানিক উঠে গিয়ে দোয়েলের পালকটি তুলে রাখছিলেন তাঁর

পালকসংগ্রহের মধ্যে। রাখতে গিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীলকণ্ঠের পালকটি নূতন ক'রে বিস্মিত করছিল যেন তাঁকে। প্যারা-ডাইস ফ্লাই-ক্যাচারের ল্যাজের লম্বা পালকটিও ছিল তাঁর সংগ্রহের মধ্যে, সেটির দিকেও স্নেহভরে চাইছিলেন তিনি মাঝে মাঝে। সেই অদ্ভুত সুন্দর পক্ষী-দম্পতিকে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি যেন চোখের সামনে—হিন্দী নামটিও চমৎকার—দুধরাজ, সত্যিই যেন রাজারাণী, বাদশা-বেগম বললে আরও ভাল হয়। আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক পালক দেখে যেতে লাগলেন তিনি···ঘুঘু, শকুনি, শিকরে, টিয়া, বটের, তিত্তির···কত রকম পালক···

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "বার্মা রেফিউজি মানে ? খুলেই বল না।"

"মানে, জাপানীর ভয়ে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে। রাস্তায় বাপ মা ভাই বোন ম'রে গেছে সব, ডাকাতের হাতে পড়েছিল আসামের জঙ্গলে। এই মেয়েটি পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে কেবল! গায়ের গয়না বিক্রি করতে করতে এতদূরে এসে পৌঁছেছে। রাত্রে জাহাজঘাটে এসে নেবেছিল, তারপর ধর্মশালা খুঁজতে খুঁজতে ভুল রাস্তা ধ'রে শহরের বাইরে গিয়ে পড়ে। তোমরা সকালে যখন পাখি দেখছিলে, তখন আমি খেজুর-রসের চেষ্টায় এগিয়ে দেখি, বাগানের ধারে পুলটার ওপর মেয়েটি ব'সে আছে ম্লানমুখে। বাগানের ও-পাশে শিবু মিত্তির থাকে, তার কাছ থেকে পেয়ালা আনতে যাচ্ছিলাম। ফেরবার মুখে দেখি, তখনও ব'সে আছে মেয়েটি। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় নিলাম। তারপর তো জানই সব—"

কবি বললেন, "আহা, ভারি বিপদে পড়েছে তো মেয়েটি !"

কবির মনটা সত্যিই ভারাক্রান্ত হয়ে এল। রূপচাঁদ নিবিষ্টচিত্তে চা খেতে লাগলেন। আর এক ডিশ খাবারও এসে পড়ল।

কবি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কি এইখানেই থাকবে নাকি ?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না প্রথমটা। মনে হ'ল, এ বিষয়ে কবির

সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নন তিনি ততটা। কবি কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক।

"মেয়েটি কি এইখানেই থাকবে নাকি ?"

রূপচাঁদ জবাব না দিয়ে আর পারলেন না।

"কি ক'রে বলব বল ?"

"এ দেশে ওর আত্মীয়স্বজন আছে নাকি কেউ ?"

"জানি না তো। আমাকে কেঁদে কেটে ধরেছে একটা আশ্রয় যোগড় ক'রে দেবার জন্যে। চেষ্টা করছি, তারপর কি হয় কে জানে!"

"ওই প'ড়ো বাড়িতে ও একলা থাকতে পারবে ?"

"তা কি পারে কখনও!"

"কে থাকবে তা হ'লে ওর সঙ্গে ?"

রূপচাঁদ জবাব দিলেন না, একমনে কচুরি চিবোতে লাগলেন। কথাটা আরও চাপা প'ড়ে গেল, বৈজ্ঞানিক ফিরে এসে যখন রূপচাঁদেব প্যাকেটটা তুলে বললেন, "এটাতে কি ?"

"ওটা একখানা শাড়ি"

"শাড়ি ? ও"—

বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল এর বেশি আর অগ্রসর হ'ল না। তিনি প্যাকেটটা টেবিলে রেখে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কবি প্রশ্ন করলেন, "শাড়ি ? কার জন্যে শাড়ি কিনলে ?"

"শাড়ি আবার কার জন্যে কেনে লোকে! পরিবারের জন্যে। রমেনদের দোকানে দেখলাম, টাঙানো রয়েছে, দামটা শস্তা মনে হ'ল, নিয়ে যাচ্ছি, গিন্নীর যদি পছন্দ হয়, রেখে দেওয়া যাবে"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠলেন, "চুপ চুপ, একটা চোরপাখি এসেছে—চেষ্টনাট-বেলিড্ নুটহ্যাচ্। দেখবেন ? ওই আমগাছে রয়েছে। গাছের ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়—"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি দুরবীনটা নিয়ে চোখে লাগালেন। কবিও গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। রূপচাঁদ আর একটি কচুরি মুখে পুরলেন।

## ৩

কবি-গৃহিনী মন্দাকিনী অতিশয় চাঁছা-ছোলা প্রকৃতির লোক। কবিত্ব-টবিত্বর ধার ধারেন না বিশেষ। অতিশয় স্বাভাবিক নারী-জীবন যাপন ক'রে থাকেন ভদ্রমহিলা। অনেকগুলি সন্তানের জননী, নানারকম রান্নায় সিদ্ধহস্ত। উলবোনা, সেলাই করাও শিখেছিলেন এককালে; কিন্তু আজকাল ওসব নিয়ে বসবার সময়ও নেই, পয়সাতেও কুলোয় না। সংসারের ন্যায্য খরচই কুলোতে পারেন না, ওসব সৌখিন খরচ করবেন কোথা থেকে! কর্তা 'রিটায়ার' করার পর থেকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ওসব। কবি ছিলেন অধ্যাপক। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শহরে বাড়িখানা আছে, জমি-জমাও আছে কিছু। যা পেনশন পান তাতে কুলিয়ে যায়। কিন্তু কোনক্রমে। সংসারের সমস্ত ভার মন্দাকিনীর উপর। আজকাল ঝি-চাকর পাওয়া যায় না, একা হাতে মন্দাকিনীকেই সব করতে হচ্ছিল এতদিন। বাসন-মাজা, ঘর-নিকানো, রান্না, সাবান-কাচা সমস্তই কবছিলেন। সম্প্রতি রূপচাঁদ একটি ঠিকে ঝি যোগাড় ক'রে দিয়েছেন। এত কাজ একা করা সম্ভব হচ্ছিল তার কারণ বাড়িতে এখন লোকজন কম। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠটি ব্যতীত আর সবই কন্যা। তাদের বিয়েও হয়ে গেছে। সবাই এখন শ্বশুরবাড়িতে। ছেলে মণ্টুর বয়স বছর দশেক, মামার বাড়িতে থেকে সে স্কুলে পড়ে। মামীর সে খুব প্রিয়, মামী তাকে ছাড়তে চায় না। উপস্থিত স্বামীকে নিয়েই মন্দাকিনীর সংসার। তবু কিন্তু মন্দাকিনীর অবসর নেই। তিনি সংসারের কাজ নিয়েই থাকেন, ও ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না তাঁর। সংসারকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁর যত ঘোরা-ফেরা। রান্নার অবসরে কখনও ভাঁড়ার গোছাচ্ছেন, কখনও বড়ি দিচ্ছেন, কখনও আচার করছেন, কখনও আমসত্ব। চিনি আজকাল দুর্লভ হয়েছে, চিনি পেলে জ্যাম জেলি

করার সখও আছে। তা ছাড়া আছে হাড়-পাঁজরা-বের-করা একটি গাই। মন্দাকিনী সখ ক'রে তার নাম রেখেছেন সুন্দরী। দু'বেলায় মেরে-কেটে গরুটি সের খানেক দুধ দেয় কি না সন্দেহ, কিন্তু তাতেই মন্দাকিনী গদগদ। দিবারাত্রি গরুটির সেবা ক'রে চলেছেন। কখনও তাকে ফ্যান খাওয়াচ্ছেন, কখনও নাদা পরিষ্কার করছেন, কখনও জাব মেখে দিচ্ছেন, কখনও গোবর পরিষ্কার করছেন। সুতরাং 'ড্রইং-রুম' ব'লে যদিও তাঁদের একটি ঘর আলাদা করা আছে এবং সেখানে যদিও মাঝে মাঝে অধ্যাপক মশায়ের বন্ধু-বান্ধবদের অভ্যাগম ঘটে, কিন্তু মন্দাকিনীর সেখানে গিয়ে বসবার অবসর নেই। তাঁকে সেখানে মানায়ও না ঠিক। তাঁর বেশবাস কথাবার্তা হাব-ভাব সমস্তই সেকেলে ধরণের। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত রীতিমত অন্তঃপুরিকাই ছিলেন, অচেনা লোকের সামনে বেরুতেন না। ইদানীং অবশ্য বেরোন, কিন্তু স্বস্তি পান না। কোনও মহিলার সমাগম হ'লে আনন্দবাবুর ডাকাডাকিতে মাঝে মাঝে তাঁকে 'ড্রইং-রুমে' এসে বসতে হয়, কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারেন না তিনি সেখানে। রান্নাঘরে ডালটা চড়িয়ে এসেছেন, না নাড়লে ধ'রে যাবে, কিংবা গোয়াল-ঘরে সুন্দরীর নাদায় হয়তো জল নেই—এই ধরণের একটা কিছু তাঁর মনে প'ড়ে যায়, আর তখনই তিনি উঠে আসেন। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দিকে ঘটা ক'রে মন দিতে পারেন না তিনি। আনন্দবাবুর দিকে মনোযোগ দেওয়াটাও খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। তিনি স্বামী আছেন আছেন, তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না মন্দাকিনী। তিনি যা রাঁধবেন স্বামীকে তাই খেতে হবে, স্বামী কি খেতে পছন্দ করেন, তা বিচার করবার সময় নেই তাঁর। গেরস্থ ঘরে অত পছন্দ-অপছন্দর বায়নাক্কা তুললে সংসার চালানো যায় না—মন্দাকিনীর এই ধারণা। আনন্দবাবুও এ নিয়ে বকাবকি করেন না আর। যা পান মুখ বুজে খেয়ে নেন। স্ত্রীর সম্বন্ধে আনন্দবাবুর ধারণা সংস্কৃত-যুগ-ঘেঁষা।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।' পত্নী একটা সামাজিক প্রয়োজন। সৌখিন আসবাবের মত কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার বস্তুও যেমন নয়, অনাদরে আবর্জনার মত আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার জিনিসও নয়। অতিশয় পবিত্র এবং প্রয়োজনীয়। আনন্দবাবু বকাবকি করেন না আর। পেন্‌শনটি পাওয়ামাত্র মন্দাকিনীর হাতে দিয়ে দেন। মন্দাকিনীর ফরমাশ অনুসারেই বাজারের জিনিসপত্র কিনে আনতে হয় তাঁকে। তাঁর যে একটা আলাদা সত্তা আছে, আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, আলাদা জগৎ আছে, তা মন্দাকিনী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন ব'লে মনে হয় না। স্বামী তাঁর জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ, সুতরাং তাঁর জীবন অনুসারেই স্বামীকে চলতে হবে। অন্য রকম যে কিছু হওয়া সম্ভব, তা মন্দাকিনীর কল্পনাতীত। তাঁর সুন্দরী গাই এবং স্বামী আনন্দমোহনকে ঠিক যদিও এক দৃষ্টিতে দেখেন না তিনি, কিন্তু হাবভাব থেকে মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গীটা অনেকটা এক রকমই। তা ব'লে স্বামীকে তিনি যে অবজ্ঞার চোখে দেখেন, তাও নয়। তাঁর মঙ্গলের জন্য ব্রত-উপবাস করেন, তাঁর শরীর কিসে ভাল থাকবে সেজন্য তাঁর সশঙ্ক চিন্তার অন্ত নেই। তাঁর সম্বন্ধে গৌরব-বোধও আছে যথেষ্ট। তিনি যে কত বড় বিদ্বান অধ্যাপক, কত বড় কবি —এ সম্বন্ধে মন্দাকিনী খুবই সচেতন। তাঁর প্রতিবেশিনী হালদার-গিন্নীর কাছে অত্যুক্তিপূর্ণ অনেক গল্প করেন তিনি এ নিয়ে। না, স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা নেই মন্দাকিনীর মোটেই। তিনি যেমন মা-ষষ্ঠী মানেন, বারবেলা মানেন, ভূত-প্রেত কবচ-মাদুলি মানেন, স্বামীকেও তেমনি দেবতা ব'লেই মানেন। পায়ে পা ঠেকে গেলে প্রণাম করেন, পাদোদকও খান দরকার হ'লে। যে ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, সেই আনন্দমোহন তরফদার যে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বহু জন্মজন্মান্তরের জের টেনে এ জন্মেও আবির্ভূত হয়ে তাঁর কপালে সিন্দূর দান করেছেন—এ সম্বন্ধে মন্দাকিনীর কোনও সন্দেহ

নেই। আকাশ নীল, বরফ ঠাণ্ডা—এসব যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আনন্দ-মোহন তরফদারও তেমনই একমাত্র মন্দাকিনী দেবীর প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত—এই তাঁর ধারণা। মন্দাকিনীকে অতিক্রম ক'রে আনন্দ-মোহনের আর একটি সত্তা থাকা সম্ভব কি না এবং সেটা কি রকম তা নিয়ে তিনি কোনও দিন মাথা ঘামান নি, তাঁর ঘরের চৌকিটা চতুষ্পদ না হয়ে অষ্টপদ হ'লে কি রকম হ'ত তা নিয়ে যেমন তিনি মাথা ঘামান না কখনও।

বলা বাহুল্য, মন্দাকিনী দেবী মাথা না ঘামালেও আনন্দমোহনের আর একটি বিশিষ্ট সত্তা ছিল। সেই বিশিষ্ট সত্তার প্রধান লক্ষণ সৌন্দর্য-বোধ, এবং প্রধান আকাঙ্খা রূপ-পিপাসা। এইজন্যেই তিনি কাব্যচর্চা করেন, এই জন্যেই তিনি পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে মেতেছেন এবং ঠিক এইজন্যেই বার্মা-ফেরত যুবতীটির কালো চোখের চকিত দৃষ্টিতে তাঁর মনের আকাশে যে বর্ণসম্ভার ফুটে উঠল তা সৌন্দর্যে ইন্দ্রধনুকেও ছাড়িয়ে গেল এক নিমেষে।

তাঁর মানসলোকের এই সব খবর মন্দাকিনী কখনও রাখেন নি, রাখবার দরকারই হয় নি তাঁর। স্বামী সম্বন্ধে যে খবরগুলি তিনি জানেন, সেইগুলিই পর্যাপ্ত তাঁর পক্ষে। তিনি জানেন, আনন্দমোহন কাছা-খোলা প্রকৃতির লোক, কিন্তু সর্ববিষয়ে সর্দারি করতে যাওয়া চাই। তিনি জানেন, আনন্দমোহনের ধাতটা কোফো, কিন্তু রাত্রে মাথার দিকের জানলা খুলে শোবার লোভটি প্রচুর। তিনি জানেন, তরকারিতে বেশি মসলা দিলে আনন্দমোহনের পেট খারাপ হয়, কিন্তু আনন্দমোহনের ইচ্ছেটা বাড়িতে রোজই তেল-ঘি-মসলা-ওলা গরগরে তরকারি হোক। তিনি জানেন, আনন্দমোহন বাইরের লোকের কথায় নাচবার জন্যে পা-টি সর্বদা বাড়িয়ে আছেন, অথচ নাচের 'ন' পর্যন্ত জানেন না তিনি। এই 'রিটায়ার' করবার পর সেদিন যেমন হ'ল। নিতাইবাবুর কথায় নেচে পোষ্ট-অফিস থেকে টাকা বের ক'রে শেয়ারে মনোহারী দোকান খুললেন। মন্দাকিনী পইপই ক'রে বারণ করেছিলেন, কিছুতেই শুনলেন না।

ফলে টাকাগুলি গেছে। তিনি জানেন যে, আনন্দমোহন যেটি দরকারী কাজ সেটি কিছুতে করবেন না। দিস্তা দিস্তা কাগজ কিনে ছাইভস্ম কত কি যে রোজ লিখে যাচ্ছেন পাতার পর পাতা, অথচ সেজো মেয়েটার জ্বর হয়েছে খবর পেয়েও একটি চিঠি লেখেন নি সেখানে। আনন্দমোহন-চরিত্রের এই সব কথা মন্দাকিনী জানেন। রঘুবংশ বিষয়ে তাঁর থীসিস যে বিদ্বৎ-সমাজে কতটা সুখ্যাতি লাভ করেছে, অধ্যাপক হিসাবে তাঁর বিদ্যাবত্তা, তাঁর অধ্যাপনা কৌশল, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য যে ছাত্র-সমাজকে কত মুগ্ধ ক'রে রেখেছে, তাঁর সৌন্দর্যবোধ, রসোচ্ছলতা, সাবলীল কবিত্বশক্তি যে যে-কোনও কবিযশপ্রার্থীর ঈর্ষার বিষয়—এসব খবর মন্দাকিনী জানতেন না, জানবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এই বুড়ো বয়সে তাঁর স্বামী যে তাঁর মেয়ের বয়সী কোনও মেয়েকে দেখে আত্মহারা হয়ে পড়তে পারেন—এ কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল মন্দাকিনীর পক্ষে। ইদানীং অমরবাবুর পাল্লায় প'ড়ে পাখির হুজুকে মেতেছেন এবং দূরবীন কিনেছেন—এই তিনি জানতেন। এই দুঃসময়ে অত টাকা খরচ ক'রে দূরবীন কেনাতে আপত্তি ছিল তাঁর। জামাই-ষষ্ঠীতে ছোট জামাইকে ভাল ক'রে তত্ত্ব দেওয়া হয় নি গেল বছর, এ বছরও যদি না দেওয়া হয়, তা হ'লে কুটুমবাড়িতে আর মান থাকবে না। কিন্তু হুজুকে মাতলে তো ওঁর জ্ঞান থাকে না—দুম ক'রে অত টাকা খরচ ক'রে দূরবীন কিনে বসলেন একটা! দূরবীন দিয়ে কাক আর শালিখ দেখে কার কি হবে! আনন্দমোহন-চরিত্রের যতটুকু তিনি জানতেন, তাতে তাঁর এ আচরণ বেমানান হয় নি কিছু। কিন্তু তিনি দূরবীন দিয়ে পাখি ছাড়া অন্য কিছুও যে দেখছেন, এ তিনি ভাবতেও পারেন নি, কারণ আনন্দমোহন-চরিত্রের এ অংশটুকু অজ্ঞাত ছিল তাঁর কাছে। তাই সেদিন যখন বেলা একটা পর্যন্ত আনন্দমোহন বাড়ি ফিরলেন না, তখন এ কথা ভাবা মন্দাকিনীর পক্ষে অসম্ভব ছিল যে, তিনি ওই বার্মা-ফেরত মেয়েটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুপুর রোদে টো-টো ক'রে।

আনন্দমোহন সত্যিই কিন্তু চাকর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। নিজের বাড়ির জন্যে হ'লে খুঁজতেন না, কিন্তু এর জন্যে খুঁজছিলেন। ওই আশ্রয়হীনা মেয়েটির হিতার্থে কিছু একটা করবার জন্যে তাঁর সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। তাঁর মনে হচ্ছিল, করিৎকর্মা রূপচাঁদ নিপুণ দক্ষতা-সহকারে সব ক'রে ফেলছে, তিনি কিছুই পারছেন না, তিনি হেরে যাচ্ছেন। মেয়েটির চোখে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। রূপচাঁদ তার বাড়ি যোগাড় ক'রে দিয়েছে, চৌকি যোগাড় ক'রে দিয়েছে, একটা হোটেল থেকে খাওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছে। দাই কিংবা চাকর যোগাড় করতে পারে নি এখনও। সকালবেলা অমরেশের সঙ্গে পক্ষী-পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে প'ড়ে গেল যে, আগরপুরে তাঁর এক ছাত্র মহেশলাল আছে। মহেশলাল বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তার বাড়িতে তার বিয়ের সময় তিনি গেছেনও একবার। মনে হ'ল, মহেশলাল ইচ্ছে করলে অনায়াসে একটা চাকর যোগাড় ক'রে দিতে পারে। কথাটা যখন মনে হ'ল, তখন অমরবাবু সোচ্ছ্বাসে বক্তৃতা করছিলেন নীলকণ্ঠ পাখির বিষয়ে। বক্তৃতার মাঝখানেই আগরপুর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়াটা অশোভন হবে বিবেচনা ক'রে আনন্দবাবু বক্তৃতাটা শুনছিলেন। বক্তৃতার দু-চারটে কথা তাঁর মনে আটকেও ছিল। নীলকণ্ঠ পাখি যে ব্যাঙ খেতে খুব ভালবাসে, সাপ পেলেও ছাড়ে না, এ খবর দুটো অদ্ভুত মনে হয়েছিল তাঁর। অমরেশবাবু বলছিলেন, শীতকালে ওর সৌন্দর্য ঠিক বুঝতে পারবেন না। মার্চ মাস পড়লে তখন দেখবেন ওর বাহার। চতুর্দিকে সোরগোল তুলে সঙ্গিনীকে ঘিরে ঘিরে কত রকম কসরৎই যে ও দেখাবে তখন দেখবেন। সোঁ ক'রে আকাশে উড়ে যাবে অনেক দূর পর্যন্ত, তারপর 'ডাইভ' (dive) করার মত ক'রে সঙ্গিনীর দিকে সোজা নেবে আসবে আবার, উচ্ছ্বসিত কলরবে নীল রঙের বাহার ছড়িয়ে। অমর বাবু আর একটা পাখি দেখিয়েছিলেন—শ্রাইক (Shrike), বাংলা নাম ক্যারকাটা। অদ্ভুত ধরনের পাখিটা। ছাই-ছাই রঙ, টেলিগ্রাফের

তারের উপর ব'সে ছিল ঘাড় বেঁকিয়ে। শুধু চতুর নয়, পাখিটার ভাবভঙ্গীতে কুটিল ভাবও ফুটে উঠেছিল একটা। কুহু কুহু ক'রে একটা কোকিল ডাকছিল। কবির হঠাৎ মনে হয়েছিল, ক্যারকাটা পাখিটা যেন ঘাড় বেঁকিয়ে মনে মনে বলছে—

ডাকছ ডাকো—কুহু কুহু কুহু
শুনেছি সবই হুঁ হুঁ—

অমরবাবু পাখির বাসা নিয়েও কি দু-চার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার সব কথায় মন দিতে পারছিলেন না তিনি। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, রূপচাঁদের চোখ এড়িয়ে আগরপুরের দিকে তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে পারলে বাঁচেন যেন তিনি। রূপচাঁদের চোখ-এড়ানো দুঃসাধ্য হয় নি, কারণ আপিসের সময় হতেই রূপচাঁদ চ'লে গেলেন। বেগ পেতে হয়েছিল বৈজ্ঞানিককে নিয়ে। তাঁর বক্তৃতা আর কিছুতেই থামে না। তাঁর বক্তৃতা যে খারাপ লাগছিল তা নয়, খুবই ভাল লাগছিল, কিন্তু ভাল ক'রে মন দিয়ে শুনতে পারছিলেন না কিছুতে। অদ্ভুত একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিলেন। শীতকালের রোদে আমবাগানটা আশ্চর্যরকম ভাল লাগছিল, ঝোপে-ঝাড়ে গাছের আড়ালে-আবডালে নতুন-চেনা পাখিদের আবার দেখতে পেয়ে সমস্ত মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল বার বার, অমরবাবুর উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে বিহঙ্গ-জগতের নানা রহস্য সম্বন্ধে উৎসুক হয়েও উঠেছিলেন তিনি, কিন্তু অন্তরের নেপথ্যলোকে এই মেয়েটি কি যে মায়ার প্রভাব বিস্তার করছিল, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

...কবি ফিরলেন যখন, তখন একটা বেজে গেছে। মন্দাকিনী তাঁর পথ চেয়ে অনাহারে চিন্তিত মুখে ব'সে ছিলেন। নানারকম দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তাঁর। সম্ভব অসম্ভব নানারকম। মনে হচ্ছিল, কোথায় কোন্ বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শুয়ার বাঘ সাপ-খোপ কত কি আছে, কামড়ে দিলেই হ'ল। ছেলেবেলায় বুনো-শুয়ার-চেরা একটা লোক দেখেছিলেন, তার রক্তাক্ত ছবিটা বার বার মনে জাগছিল। বাঘে ধ'রে

নিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। চিন্তিত হয়ে বৈজ্ঞানিকের বাড়িতেও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বাড়িতে ছিলেন না। পথ চেয়ে শঙ্কিত চিত্তে ব'সে ছিলেন মন্দাকিনী। স্বামীকে সশরীরে ফিরতে দেখে শঙ্কা অন্তর্হিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হয়ে উঠলেন।

"কি আক্কেল তোমার ! কোথা ছিলে এতক্ষণ ?"

"একটা পাখির পেছনে পেছনে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম—"

"পাখিব পেছনে? গরুব পেছনে পেছনে যাওয়া যায়, পাখির পেছনে পেছনে গেলে কি ক'রে ? উড়ছিলে নাকি ?"

কবি স্ত্রীকে চিনতেন, প্রত্যুত্তর করলেন না। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

মন্দাকিনী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি ?"

"একটা নতুন ধরনের পাখি। এর আগে দেখি নি কখনও। শ্রাইক একটা।"

"কি ?"

"শ্রাইক, বাংলা নাম কুরকুটি"

ক্যারকাটা নামটা ঠিক মনে পড়ল না কবিব।

"কুরকুটি ?"

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মন্দাকিনী স্বামীর দিকে। দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। কবি তাঁর দিকে পিছন ফিবে নীরবে জামা-কাপড় ছাড়তে লাগলেন। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, "আমি চান করব না।"

"পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুলোয় ভরতি, চান না ক'রেই খাবে ? গবম জল তো উননে বসানোই রয়েছে, চান করতে আর কতক্ষণ লাগবে ?"

"বেশ, দাও তা হ'লে।"

নিজের তেতলার ঘরটিতে একা শুয়ে ছিলেন কবি চুপ ক'রে। খেয়ে এসে লেপটি গায়ে ঢাকা দিতেই তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু কিসের

একটা শব্দে তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চোখে পড়ল, দেওয়ালের চুনবালি খ'সে পড়েছে একটা জায়গা থেকে। পৈতৃক পুরনো বাড়ি। বহুদিন মেরামত করানো হয় নি। এই চিন্তার সূত্র ধ'রে গুটি গুটি আরও যেসব চিন্তা মনের প্রত্যন্তপ্রদেশে উঁকি দিতে লাগল, তা ভয়াবহ। চুন, বালি, সিমেণ্ট, পারমিট, রাজমিস্ত্রি, ভারা···। তাড়াতাড়ি লেপ ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। উঠেই জানালাটা খুলে দিলেন; জানালাটা খুলে দিতেই চোখে পড়ল নীলাকাশ এবং সেই নীলাকাশের পটভূমিকায় একটা ন্যাড়া আমড়াগাছ। আমড়াগাছের উঁচু ডালে ব'সে আছে একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আকাশের দিকে মুখটা ঈষৎ তুলে পড়ন্ত রোদটা উপভোগ করছে যেন প্রাণ ভ'রে। জানালাটির ধারেই কবির লেখার জায়গা, তার নীচেই লেখবার সরঞ্জাম ছিল সব। চেয়ারটি টেনে কবি ব'সে পড়লেন। বাড়ির জীর্ণ সংস্কারের কথা মনে রইল না আর। একদৃষ্টে তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন তিনি পাখিটার দিকে চেয়ে। ঠিক পাখিটার দিকেও চেয়ে নয়, পাখিটাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মন কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল অনন্ত আকাশে। একটু পরে আর একটা নীলকণ্ঠ এসে বসল। প্রথম নীলকণ্ঠটা যেখানে ব'সে ছিল, তার নীচের ডালটায়। অতিশয় নির্বিকারভাবে, যেন সে প্রথম নীলকণ্ঠটাকে দেখতেই পায় নি। প্রথম নীলকণ্ঠটা কিন্তু উচ্ছ্বসিত কলরবে ডেকে উঠল। এত উচ্ছ্বসিত যে, তা কর্কশ কি মধুর, তা বিচার করবার আর অবসর রইল না, উচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেসে গেল কবির মন। তারপরই সে উড়ল ডানা মেলে। বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু ক'রে দিলেন হঠাৎ—

বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে
ও নীলকণ্ঠ, রঙ যে তোমার
উপছে পড়েছে ডানার নীচে।

আ মরি মরি
পাশে ব'সে আছে সোহাগী সখীও নীলাম্বরী !
সয় না তর
খুলে যায় মন খুলে যায় ডানা
কণ্ঠে জাগে যে কলস্বর···

দেখি তখন
এ কি স্বপন···
ঘন-নীল আর ফিকে-নীল আর আবছা-নীল
সাগরের নীল, আকাশের নীল, নীল-নিখিল
ফোয়ারার মত অনন্ত নীলে ছড়িয়ে পড়ে
চমক-লাগানো নীলের ঝড়ে
ঊর্ধ্বে নিম্নে আগে ও পিছে,
বাদামী রঙের ছাই মেখে গায়ে
আত্মগোপন করেছ মিছে।

কবিতাটা লিখে কবি চোখ তুলে দেখলেন, পাখি দুটো চ'লে গেছে। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ। মেয়েটির মুখটা মনে প'ড়ে গেল ; কি অদ্ভুত শ্যামল স্নিগ্ধতা ওতপ্রোত হয়ে আছে তন্বী দেহটিতে ! যখন চাকরটাকে নিয়ে গেলেন, তখন তার চোখে মুখে ফুটে উঠল কি আনন্দ ! অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কবি অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। কাগজ কলম নিয়ে আবার শুরু করলেন লিখতে।—

বল না বোঝাব সখি কি ক'রে
তোমার অঙ্গ ভরি কি মাধুরি মরি মরি
তোমার নয়ন কোণে কি আলো যে ঠিকরে !

সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে
অরূপ-লোকের মায়া রূপলোকে এসে যেন
অতিশয় দ্বিধা-ভরে থেমেছে।

থমথমে চারিদিক,—চুপ চুপ চুপালি
মেঘেতে লেগেছে রঙ সোনালি ও রূপালি
ভূপালী না ভৈরবী চোখে ওর কি ভাষা
তৃপ্তি না পিপাসা
কল্পনা-বীণা বাজে আকুল ছন্দা যে
মুঞ্জরি উঠিয়াছে রজনী-গন্ধা যে
শ্যামল তন্বী তনু-শিখরে
বল না বোঝাব সখি কি ক'রে!

লেখা শেষ ক'রে কবি ব'সে রইলেন। অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। অন্ধকার নামতে লাগল চতুর্দিকে। তার সঙ্গে স্বপ্নও।

৪

"ব'সে পড়ুন, ওইখানেই ব'সে পড়ুন—"

বৈজ্ঞানিক ফিসফিস ক'রে গর্জন ক'রে উঠতেই ব'সে পড়লেন কবি। শহরের বাইরে অনেক দূরে এসে পড়েছিলেন তাঁরা, নদীর ধারে ধারে বক আর বাটানের দল দেখতে দেখতে। উদ্দেশ্য—নদীটা পেরিয়ে কিছু দূরে যে বিলটা আছে, সেইখানে গিয়ে শীতের অতিথি কাদা-খোঁচার দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন কবির।

কবি ব'সে পড়তেই বৈজ্ঞানিক হামাগুড়ি দিয়ে স'রে এলেন তাঁর কাছে।

"ওই দেখুন হলদে খঞ্জন একটা—Yellow Wagtail —এরা উইনটার ভিজিটার—"

"কোথা থেকে আসে ?"

"রাশিয়া থেকে। গ্রীষ্মকালে এরা Ural Mountains থেকে কামস্কাট্‌কা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, আফগানিস্থানের উত্তরেও কিছু কিছু দেখা যায়। অতদূর থেকে ওরা উড়ে আসে এ দেশে—"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন ছোট্ট পাখিটিকে। ল্যাজ দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কামস্কাট্‌কার পাহাড়ের আগ্নেয়গিরির খবর ও রাখে নাকি ? সোভিয়েট বিপ্লবের আঁচ লেগেছে নাকি ওর গায়ে দেখলে তো মনে হয়, এ দেশেরই শ্যামাঙ্গিনী মেয়ে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "খঞ্জন কিন্তু আরও চার রকম আছে, White Wagtail, Large Pied Wagtail, Grey Wagtail, Yellow headed Wagtail। এর মধ্যে Large Pied Wagtail এ বাসিন্দা, দেশেরই সব সময়ে থাকে। শুনুন, ডাকছে, শুনতে পেলেন ?"

কবি ধমকে উঠলেন, "পেয়েছি। আপনি একটু চুপ করুন তো।"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, কবি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন খঞ্জন পাখিটার দিকে তন্ময় হয়ে। মনে হচ্ছে, একটা অপরূপ কিছু দেখছেন যেন তিনি। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন দুজনে।

বৈজ্ঞানিক সহসা আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"ওই দেখুন"

"কি ?"

"দোয়েল। শীতকালে বড় দেখা যায় না। ওই ঝোপটার ধারে টপ ক'রে নামল। পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে বোধ হয়। চলুন, ওঠা যাক।"

আবার দুজনে চলতে শুরু করলেন। ঝোপটার কাছাকাছি এসে বৈজ্ঞানিক বললেন, "দাঁড়ান একটু, আমি দোয়েলটাকে দেখে আসি ভাল ক'রে। ও বোধ হয় ওই ঝোপটাতেই থাকে।"

কবি দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে পড়ল, একটা ফিঙে ব'সে আছে

টেলিগ্রাফপোষ্টের উপর। চমৎকার মিষ্টি সুরে ডাকছে। আর একটা ফিঙে উত্তর দিচ্ছে তেমনই মিষ্টি সুরে। কবির মনে হ'ল, বিশ্ব জুড়ে এই চলেছে অহোরাত্র। অন্তরতমকে ডাকছে সবাই। নিরন্তর চলেছে এই ডাকাডাকি—গানে গন্ধে বর্ণে। ডানার কথা মনে পড়ল। অন্য-মনস্ক হয়ে পড়লেন খানিকক্ষণ। দূরের শিমুলগাছটায় প্রকাণ্ড একটা শকুনি এসে বসল। বিরাট পাখি। শকুনি সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছে হ'ল। ঘাড় ফিরিয়ে বৈজ্ঞানিককে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? হঠাৎ দেখতে পেলেন, প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন তিনি ঝোপটার পাশে, এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে কি দেখছেন। কবি এগিয়ে গেলেন।

"কি দেখছেন?"

"দেখতে পেলাম না ঠিক। পালাল। চলুন"

"শিমুলগাছটায় শকুনি বসেছে একটা—"

"ও, কই?"

"ওই যে—"

বৈজ্ঞানিক দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন একবার।

তারপর বললেন, "এটা হচ্ছে White-Backed Bengal Vulture। পিঠের ওপর সাদা আর গলায় কলারের মত সাদা আছে, দেখুন। এইটেই সাধারণত দেখা যায়, আর এক রকমও দেখা যায়, Long-Billed Vulture—Gyps Indicus —এদের ঠোঁট আর একটু লম্বা হয়, পিঠের কাছে সাদা নেই। লাল-গলা শকুনিও আছে এক রকম, দেখেছেন নিশ্চয়, সেগুলোর নাম King Vulture, পণ্ডিচেরি ভালচারও বলে কেউ কেউ। বামুন শকুনিও বলে—"

কবি কিন্তু ভাবছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। তাঁর মনে হচ্ছিল, শকুনির ছদ্মবেশে এ যেন আর কেউ। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল, সেকালে রোমে কার্নিভালের সময় সকলে যেমন ছদ্মবেশ প'রে বেরুত, এ বোধ হয় তেমনই একটা ঘটনা। শকুনির

ওই জবড়জঙ পোষাকের অন্তরালে হয়তো লুকিয়ে আছে কোনও রাজপুত্র বা রাজকন্যা। যে খঞ্জনটা এখনই দেখলেন, তার ওই চটুল চঞ্চল গতি, মিষ্টি মিহি সুর, ওই স্বর্ণাভ কান্তি—এ কি শুধু পাখির ?

বৈজ্ঞানিকের একটা কথা মনে পড়ে হঠাৎ। গত বার শকুনিব ডিম সংগ্রহ করিতে পারেন নি তিনি। এবার করতেই হবে। শীতের গোড়ার দিকে অনেক সময় ডিম পাড়ে ওরা। হনহন ক'রে এগিয়ে চললেন শিমুলগাছটার দিকে।

"ওদিকে কোথা চললেন আবার? বিলের বাস্তা তো এই দিকে—"

"শকুনির কোনও বাসা আছে কি না, দেখে আসি চলুন না। ওদের বাসা চিনতে দেরি হয় না। আর একটা মজা কি জানেন। ওরা অনেক সময় চার পাঁচটা বাসা করে, হয় একই গাছে কিংবা পাশাপাশি গাছে, কিন্তু ডিম পাড়ে মাত্র একটি। বাসা কবেছে কি না দেখে আসি চলুন।"

কবির মনে হ'ল, তড়বড়ে লোকটাব পাল্লায় প'ড়ে প্রাণ যাবে দেখছি। নিজেব চিন্তাধাবা ছিন্ন হওয়াতে বিরক্তও হয়েছিলেন তিনি একটু!

"আপনি যান মশাই, আমি এইখানেই বসছি—"

বৈজ্ঞানিক চলে গেলেন। কবি একটা উঁচু ঢিপিব উপর গিয়ে বসলেন। তিন-চারটে হলদে খঞ্জন উড়ে এসে বসল আবার একটু দূবে। কি অদ্ভুত সুন্দর পাখি! চটুলা চপলা নৃত্যপবা অথচ পলাতকা। ওই মেয়েটির সঙ্গে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কাছাকাছি আছে অথচ কত দূরে, মনে হয়, নাগালের বাইরে। মনে হয়, বাইরে যা দেখা যাচ্ছে, ও তা নয়, ও যেন অন্য কিছু। সেই অন্য-কিছুর আভাস ধরা পড়েছে কবির মনে। মনের অবর্ণনীয় অনুভূতিটা ছন্দে গাঁথবার চেষ্টা করতে লাগলেন।—

ও খঞ্জন, ও খঞ্জন,
কবির চোখে পড়ল ধরা
মূর্তি তোমার নিরঞ্জন।

অগ্নি-গিরির তপ্ত খবর
মিষ্টি সুরে আঁকচ যে
নীলচে ধূসর ওড়না দিয়ে
হলদে শাড়ি ঢাকছ যে
নৃত্যপরা চলছ ছুটে
চলচ্ছবি উঠছে ফুটে
পুচ্ছ-দোলায় কোন্ সে গানের
তালটিকে ঠিক রাখছ যে,
ও খঞ্জন!

প্রিয়ার চোখে তোমার চলার
দোল দোলানো
হঠাৎ-পাওয়ার পুলক তুমি
মন-ভোলানো
নয়কো খাঁচায় নয়কো নীড়ে
মনের বীণার মধুর মীড়ে
লুকিয়ে বেড়াও দৃষ্টি এড়াও
কিন্তু আবার ডাকছে যে
ও খঞ্জন!

ঝরনাতলায় নদীর ধারে
তীর বনেতে
তোমার নাচের আসর জমে
নির্জনেতে

একটু সাড়া পেলেই পালাও
হাওয়ার বুকে ঢেউ তুলে দাও
কবির মনে কিন্তু তুমি
পালিয়ে গিয়েও থাকছ যে
ও খঞ্জন !

নিজের কবিতায় নিজেই তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে কে ব'লে উঠল, 'কোউ'। চমকে উঠলেন কবি। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছু দেখতে পেলেন না। অদ্ভুত মিষ্টি স্বর। মনে হ'ল, মানুষের কণ্ঠে যেন কথা ক'য়ে উঠল কেউ। তার পর হঠাৎ দেখতে পেলেন। সামনের আমগাছে ব'সে আছে হলদে পাখিটা। মাথাটি কালো, ডানার ধারে ধারে কালো, ঠোঁটটি লাল, বাকি সবটা হলদে। চমৎকার হলদে, স্বর্ণসন্নিভ। মনে পড়ল বৈজ্ঞানিক দেখিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, ইংরেজী নাম Oriole, বাংলা নাম বেনেবউ। আর এক রকম আছে, তার মাথাটাও নাকি হলদে। বেনেবউ? নামটা অবশ্য খুবই লাগসই। ধনী বণিকগৃহিণীর সর্বাঙ্গ সোনায় মোড়া, কালো মুখটি ঢাকতে পারেন নি কেবল সোনা দিয়ে, পান খেয়ে ঠোঁট দুটি হয়েছে টুকটুকে লাল। লাগসই হ'লেও নামটা বড় বেশি বস্তুতান্ত্রিক। ওর মধ্যে পরশ্রীকাতরতারও ছোঁয়াচ রয়েছে যেন একটু, কবির মনে হ'ল। তার চেয়ে সোজাসুজি 'হলদে পাখি' নামটা মন্দ নয়। কিন্তু অমন চমৎকার স্বর্ণকান্তির, অমন চঞ্চল সজীবতার কোনও মর্যাদাই ফুটছে না ও নামে। 'কনক-সখী' নাম দিলে কেমন হয়? বেনেবউ উড়ে এসে বসল কাছের একটা ডালে। কবির মনে গুঞ্জন ক'রে উঠল কবিতা।—

কনক সখি, কনক সখি,
সবাই তোমায় বলছে ও কি !

শালিক চড়াই কাক ছাতারে
সকলকে হকচকিয়ে
বণিক-বধূ কেবল তুমি
গয়না বেড়াও চকমকিয়ে ?

মিথ্যা কথা, তুমি কেবল
ভ্রমরকেশী কাজল-চোখী
সবুজ পাতায় লুকিয়ে বেড়াও
কনক সখি, কনক সখি।

কবি সামনের দিকে চেয়ে দেখলেন, খঞ্জনগুলো উড়ে কনকসখীও উড়ে গেল। আর একজন এসে বসলেন সাম ডালটায়। বাদামী রঙের পাখি, ল্যাজের কাছটায় পিঠের দি আগুনের ঝলক।

একটু উড়লেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেটা। গলার কাছে মা কালো। রেডস্টার্ট একটা। থরথর ক'রে ল্যাজটা কাঁপি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে যেন অভিবাদন জানাল কবিকে। তা পিঠটা ফিরিয়ে বসল। ভাবটা যেন, আমাকেও ভাল ক' তোমার কনকসখীর চেয়ে দেখতে নেহাৎ খারাপ নই। বৈজ্ঞানিক সেদিন বলেছিলেন, মনে পড়ল, এরা কাশ্মী থেকে শীতকালে এ দেশে আসে। কবির মনে আবা কবিতা—

যে দেশেই থাক নাকো তুমি মোর মিতা গো
অঙ্গকে ঢেকে রাখ বাদামী বা সবুজে
কাব্যলোকেতে তুমি চির-পরিচিতা গো
কবিকে ঠকাতে সখি পারবে না কভু যে।

কাশ্মীরী রাশিয়ান ইরানী বা তুরানী
পেশোয়াজ ওড়না বা অঞ্চল-ঘুরানী
ওগো মন-চুরানী,
ওগো মঞ্জুরাণী,
যে বেশেই আস নাকো চিনি তোরে তবু যে।

হঠাৎ বন-বাদাড় ভেঙে হুড়মুড় ক'রে বৈজ্ঞানিক এসে হাজির হলেন।

"শকুনির বাসা দেখেছি একটা। শকুনির সম্বন্ধে আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওদের বাচ্চাকে ওরা কেমন ক'রে খাওয়ায় জানেন? ওরা নিজেরা যে মাংস খেয়ে আসে তাই উগরে দেয় বাচ্চার মুখে ছোট ছোট গুলির মত আকারে। অদ্ভুত নয়?"

কবির কাব্যলোকে বজ্রপাত হ'ল যেন!

"চলুন, ওঠা যাক"

বিলের উদ্দেশ্যে আবার বেরুলেন দুজনে। দুজনে নীরবেই যাচ্ছিলেন। বৈজ্ঞানিক হঠাৎ বললেন, "পাখির বাসা আর তাদের সন্তান-পালন দুটো ব্যাপারই অদ্ভুত। পাখির বাসা অনেকেরই নজরে পড়ে, সন্তান-পালনটা লক্ষ্য করে না অনেকে। বাবুই পাখির বাসা দেখেছেন নিশ্চয়, দর্জি পাখিদের বাসাও চমৎকার! সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে ধনেশ পাখির বাসা। গাছের গুঁড়ির গর্তে ওরা বাসা করে। সেই গর্তে স্ত্রী-ধনেশ ঢুকে নিজের মল ঠোঁটে ক'রে নিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে ফেলে—"

"মল? তার মানে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

"জিনিসটা ঠিক কি বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, নিজের droppings নিয়েই ওরা গর্তের মুখটা বোজায়, আবার কারও মতে ওদের গা থেকে চটচটে এক রকম রস বেরোয় আঠার মত, তাই দিয়ে বন্ধ করে মুখটা। সে যাই হোক, স্ত্রী-ধনেশ গর্তের মুখটা বুজিয়ে

বন্দিনী ক'রে ফেলে নিজেকে। নিজের মুখটি বার করবার মত ছোট্ট একটু ফাঁক থাকে শুধু। যতদিন সে ডিমে তা দেয়, ততদিন বাসা ছেড়ে বেরোয় না। পুরুষ-ধনেশ তখন সেই ছোট্ট ফাঁক দিয়ে স্ত্রীকে খাইয়ে যায়।" তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা হ'লে স্ত্রী-ধনেশ দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে। ভাঙা দেওয়াল আবার জুড়ে দেয়। যতদিন না বাচ্চারা বড় হয়, ততদিন তারা বন্দী অবস্থায় থাকে। স্ত্রী পুরুষ দুজনে মিলে তখন খাওয়ায় তাদের সেই ছোট ফাঁক দিয়ে। অনেকটা আমাদের আঁতুড়-ঘরের মত, নয়? ফটিক জল, বেনেবউ, এদের বাসাও চমৎকার—"

কবির কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। অন্যমনস্ক কবি ঘাড় হেঁট ক'রে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক আড়চোখে কবির মুখের দিকে আর একবার চেয়ে চুপ ক'রে গেলেন। কবিকে মনে মনে একটু ভয় করেন তিনি। অদ্ভুত লোক! তুচ্ছ একটা জিনিষ নিয়ে বিরাট একটা কিছু গড়ছেন হয়তো। এই ধরনের লোককে বোঝা শক্ত। প্রকৃতির সম্বন্ধে এঁদের কৌতূহল খুব, কিন্তু যা দেখবেন তা মানবেন না, তাকে ঘিরে কিম্ভুত-কিমাকার একটা কিছু করা চাই। না করতে পারলে তৃপ্তি হয় না কিছুতে। পাখিকে পরী করবার জন্যে ব্যস্ত। স্ত্রী-ধনেশকে বন্দিনী রাজকন্যা-টন্যা ভাবছেন হয়তো, কে জানে! আড়চোখে আর একবার চাইলেন তিনি কবির দিকে। কবি ঘাড় হেঁট ক'রে চলেছিলেন আপন মনে। আবার একটা রেডস্টার্ট এসে বসল সামনের গাছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "একটা রেডস্টার্ট এসেছে, দেখুন"

কবি বললেন, "ওর একটা বাংলা নাম দিন"

"কবিতায় ঢোকাতে পারছেন না বুঝি? কবিতা লিখেছেন ওকে নিয়ে?"

"লিখি নি, তবে—ওই পালাল! কবিতা চাই নাকি?"

মুখে মুখেই একটা ছড়া বানিয়ে ফেললেন তৎক্ষণাৎ—

তড়িৎসম ত্বরিত গতি
নয়কো তবু তুরঙ্গিনী
ভঙ্গীভরে পালায় ছুটে
পক্ষী না এ কুরঙ্গিনী ?
ছন্দভরে অঙ্গ দোলায়
এক নিমেষে মনকে ভোলায়
আগুন জ্বলে ডানার তলে
উড়ন্তিকা স্থরঙ্গিনী ।

বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকাব ! অদ্ভুত শক্তি আপনার !"

কবি বললেন, "আপনাব প্রশংসা কববাব শক্তিও তো কম নয় দেখছি। পাখিটাব নাম ফুলকি বাখলে কেমন হয ?"

"বেশ তো"

"ছোট পাখি বড় নাম মানাবে না। আগুনেব আভাও আছে—গায়ে। ওড়া মাত্রই ল্যাজেব কাছটায় আগুন জ্বলে উঠল যেন। কি চমৎকার !"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ইংবেজীতে ওব আব একটা নাম আছে—ফায়াব টেল। রেডস্টার্ট কথাটার মানেও তাই।"

বৈজ্ঞানিকের কেবলই চেষ্টা কবির মনকে কি ক'বে বিজ্ঞান-মুখী কবা যায়। করতে পারলে—তাঁর বিশ্বাস—বিস্ময়কব একটা কিছু ক'বে ফেলতে পারে লোকটা। তাঁর দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বললেন, "এইটুকু ছোট পাখি কতদূর থেকে এসেছে ! আশ্চর্য নয় ? মাইগ্রেশন ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। ভারি রহস্যময়। যে কাদাখোঁচাদের আমরা দেখতে যাচ্ছি, সেগুলো সবই প্রায় শীতের অতিথি, এ দেশে থাকে না। অথচ কেন আসে বোঝা যায় না ঠিক। অনেকে বলেন, শীতকালে ওদের বাসভূমিতে খাবার পাওয়া যায় না, রোদ থাকে না, তাই ওরা

চ'লে আসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঠিক একই জাতের পাখি ওদেশে আবার থেকেও যায় কতকগুলো, তাই—"

কবি হেসে বললেন, "বললাম তো সেদিন, ওরা প্রাণের টানে আসে"

"প্রাণের টানটাই বা কেন হয়?—বিজ্ঞানের তাই প্রশ্ন। বিজ্ঞান মনে করে, নিশ্চয়ই কোন অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্যে একদল পাখি তাদের আবাসভূমি থেকে চ'লে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই যে যেমন ধরুন না, ওই ভদ্রমহিলা যেমন বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছেন। ওটাকে আপনি যদি টান বলেন, তা হ'লে কি ঠিক হবে? জাপানী বোমা না পড়লে কি উনি আসতেন? পাখিদের সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকেরা তেমনই মনে করেন যে, ওদের চ'লে আসবারও নিশ্চয় কোন কারণ আছে—কোনও অদৃশ্য বোমা আছে—সেইটে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কাজ।"

বৈজ্ঞানিক উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাইলেন কবিব দিকে। তাঁর মনে হ'ল, ওই মেয়েটির উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোধ হয় স্পষ্ট করতে পেরেছেন তিনি কবিব কাছে। কবির মনে কিন্তু যা ঘটল, তা একটু অন্যরকম। মেয়েটির কথা উত্থাপিত হওয়াতে কবির কল্পনা-কাননে একটা নূতন ফুল ফুটে উঠল যেন।

তিনি বললেন, "টানটা কি সব সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যায়? মেয়েটি বিশেষ ক'রে এই অঞ্চলেই এল কেন, এর কারণ ও নিজেও হয়তো জানে না ভাল ক'রে। আপনি বলছেন, জাপানী বোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু অন্য জায়গাতেও যেতে পারত। এখানে আসবার মানে কি?"

বৈজ্ঞানিকের মুখ দিকে বেরিয়ে পড়ল, "আমি যদি বলি অ্যাক্সিডেণ্ট?"

কবি ফিরে চাইলেন বৈজ্ঞানিকের দিকে। হাসি উপচে পড়তে লাগল তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে।

"এইটেই প্রত্যাশা করেছিলাম। এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট আবির্ভাবটাই তো আপনারা অ্যাক্সিডেণ্টের কোঠায় ফেলে দিয়েছেন।"

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা এখন বাদ দিন, আপনার মতে তা হ'লে ও মেয়েটির এখানে আসার কারণ কি?"

"প্রারব্ধ। তার মানেই অদৃশ্য টান"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন এবার।

"ওটা কি একটা যুক্তি হ'ল, আপনিই বলুন"

"যুক্তির তো প্রয়োজন নেই আমার। নিজের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করবার জন্যেই যুক্তির দরকার। আমি মেনে নিতে চাই, ওতেই আমার তৃপ্তি। একটা অদৃশ্য টানে মেয়েটি এখানে এসেছে—এইটে ভেবেই আমার সুখ। বাজে যুক্তিব কচকচিতে দবকাব কি আমাব?"

বৈজ্ঞানিকের ঈষৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

"আপনার দরকার না থাকতে পারে, বিজ্ঞানের দরকার আছে"

কবি আর একটু হেসে বললেন, "পৃথিবীব মধ্যে সবাচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কে জানেন?"

"আপনিই বলুন কে"

"কবি। যে কবি বলতে পারে—

> ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
> ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্
> ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
> তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।

অনবদ্য সৌন্দর্যের পায়ে লীলাময়ী প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রে কৃতার্থ হয় যে, সেই কবি, সেই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, সৃষ্টিরহস্যের সারমর্ম সেই বুঝেছে।"

তর্কটা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত, কিন্তু তাঁরা বিলের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আচ্ছা লোক তো তোমরা হে, নৌকো নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে, তোমাদের পাত্তাই নেই! আশ্চর্য কাণ্ড!"

কবি বললেন, "দেরী অমরবাবুর জন্যে। উনি খানিকক্ষণ দোয়েলের পিছু পিছু ঘুরলেন, তারপর শকুনির বাসা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।"

"চি-হুইট্ চি-হুইট্ চিহু চিহু চিহু—"

একটা পাখি ডেকে উঠল।

"কি বলুন তো?"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চাইলেন। মিনিট খানেক আগে তর্ক ক'রে মনে যে তিক্ততা এসেছিল, সেটা মধুর হয়ে উঠল পাখির ডাকে।

কবির উত্তর দেওয়ার আগেই বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "দুর্গা টুনটুনি। পুরুষটা ডাকছে। ব্রিডিং প্লুমেজ (Breeding Plumage) দেখুন কেমন সুন্দর। ব্রিডিং সিজ্‌নে ওদের এই রকম রঙ হয় গায়ে, অন্য সময়ে থাকে না। দেখুন, ওই যে—"

কবি চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন, কুচকুচে কালো ছোট একটি পাখি আকাশের দিকে মুখ তুলে ডেকে চলেছে চি-হুইট্ চি-হুইট্ চিহু-চিহু। আগাগোড়া সব কালোও নয়। ডানা দুটো কালো, ঘন-নীলও আছে খানিকটা, টকটকে লালও আছে গলার পাশে। মুগ্ধ হয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "মধু খেয়ে থাকে ওরা। তাই ওদের মৌ-চোষাও বলে কেউ কেউ। এ দেশে তিন রকম দেখা যায়—নর্থ ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান সিলোনিজ আর আসাম-বার্মা রেস। আমার বিশ্বাস, আরও আছে দু-এক রকম। রঙের ঈষৎ তারতম্য শুধু। ওদের ওয়ার্বলার (Warbler) ব'লে ভুল করবেন না যেন। ঠোঁটটা লক্ষ্য করুন, একটু বাঁকা, মধু খায় কিনা।"

রূপচাঁদ বললেন, "বক্তৃতাটা নৌকোয় যেতে যেতে করলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন"

নৌকায় আরোহণ করলেন তিনজন। নৌকা ছেড়ে দিল। রূপচাঁদ বললেন, "ফ্লাস্কে ক'রে চা এনেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধ হয়। ওরে বান্‌ছা, ঢাল্ কাপে কাপে।" বালক-ভৃত্যটি কাপে কাপে চা ঢালতে লাগল। রূপচাঁদ একটি টিফিন-কেরিয়র থেকে টোস্ট, ওম্‌লেট আর কেক বার করলেন।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "এত কাণ্ড করেছেন আপনি!"

কবি বললেন, "রূপচাঁদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা রকম"

রূপচাঁদ একবার বৈজ্ঞানিকের এবং একবার কবির মুখেব দিকে চাইলেন শুধু। চোখের পাতাগুলো মিটমিট করল দু-চারবার। কোনও কথা বললেন না।

টোস্টে কামড় দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন কবি—"বাঃ, চমৎকার রুটি তো! নলিনী এ রকম রুটি করছে নাকি আজকাল? আমাদের যা দিচ্ছে, তা—"

রূপচাঁদ বললেন, "নলিনী নয়, ফির্‌পো"

"ফির্‌পো? ফির্‌পোর রুটি পেলে কোথা?"

"পুলিস সাহেবের জন্যে আসে। আমিও একখানা ক'রে নিই।"

"আমরা পাই না?"

কবি বললেন বটে, কিন্তু তিনি এ কথা ভাল ক'রেই জানেন যে, এই মফস্বলে রোজ ফির্‌পোর রুটি খাওয়ার মত অবস্থা তাঁর নয়। রূপচাঁদেরও সে কথা অবিদিত নেই। তবু তিনি বললেন, "বেশ, চাও তো পাবে"

বৈজ্ঞানিক দু-টুকরো টোস্টের মাঝখানে খানিকটা ওম্‌লেট পুরে বাঁ হাতে ধ'রে সেটা কামড়াচ্ছিলেন আর বিলটার চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর কোটের উপর পাউরুটির গুঁড়ো পড়ছিল, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না।

রূপচাঁদ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনারও চাই না কি?"

"কি?"

"ফির‍্পোর রুটি"

"রুটি? ও, আচ্ছা জিজ্ঞেস করব রত্নাকে"

সমস্ত পাউরুটিটা মুখে পুরে দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিকে।

কবি প্রশ্ন করলেন রূপচাঁদকে, "বার্মা-রেফিউজি সেই ভদ্রমহিলাটির খবর কি?"

"কার? ডানার? খবর ভালই। তুমি একটা চাকর যোগাড় ক'রে দিয়েছ শুনলাম"

"হ্যাঁ। ওঁর নাম ডানা নাকি?"

"তাই তো শুনছি। ছেলেবেলায় এক মেম নার্স ওর নাকি নামকরণ করেছিলেন Diana। বাংলায় সেটা ক্রমশ ডানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চমৎকার নাম তো! ডায়না ডানা—দুটোই চমৎকার।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তাঁর মনশ্চক্ষে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল গ্রীক দেবী ডায়েনার শবরী-রূপ। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চঞ্চলা ডায়েনা ধনুর্বাণ হস্তে শিকারের পিছু পিছু ছুটে বেড়াত সে বনে বনে, যার কঠিন হৃদয় বিগলিত হয়েছিল এণ্ডিমিয়নের প্রেমে, কবিকল্পনায় যার রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল নিত্য নবীন বনশ্রীতে, উন্মুখ মাতৃত্বের জগদ্ধাত্রী রূপে, সৃষ্টির আবেগ-মহিমায়, জীবনের দুর্জয় প্রকাশে, চরাচর-ব্যাপী বিকশিত প্রাণ-সম্পদে···মনে হ'ল, এই ডায়েনাই বোধ হয় আমাদের দেশের অনন্তযৌবনা উর্বশী, মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে বার বার প্রাণ-লক্ষ্মীর মূর্ত প্রতীক রূপে; এই ডায়েনাই বোধ হয় ডানা মেলে উড়ে আসছে অনন্ত কাল ধ'রে মৃত্যু-পরিকীর্ণ পৃথিবীর দিকে, সঞ্জীবিত করছে তাকে নবীন প্রাণধারায়, উজ্জীবিত করছে নব নব প্রেরণায়··

"বাঃ, চমৎকার! আশাই করি নি এটা"

হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"অস্‌প্রে (Osprey) একটা। দেখুন, দেখুন, কত বড় মাছ ধরেছে দেখুন।"

কবি দেখলেন, চিলের মত প্রকাণ্ড একটা পাখি আকাশে উড়ছে। দু'পায়ে ক'রে একটা মাছ ধ'রে আছে। সূর্যের আলো লেগে মাছটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে রৌপ্যদ্যুতি, ফুলঝুরি-উৎসব হচ্ছে যেন শূন্যে। পাখির বুকটা সাদা, তার উপর একটা কালো দাগ।

বৈজ্ঞানিক আবার বললেন, "এর সংস্কৃত নাম উৎক্রোশ। ডাক্তার সত্যচরণ লাহা কুররীও বলেছেন, কালিদাসে এর উল্লেখ আছে নাকি।"

একটা করুণ আর্তস্বর ফুটে উঠল আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে প'ড়ে গেল, কালিদাসের সেই শ্লোকটা

তথেতি তস্যা প্রতিগৃহ্যবাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ।

সীতাকে নির্বাসন দিতে যাচ্ছিলেন যখন লক্ষ্মণ, তখন কুররীর মত করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করেছিলেন সীতা। কবি সবিস্ময়ে শুনছিলেন। সত্যিই বড় করুণ ডাক। অমন বিশাল বলিষ্ঠ পাখি, আকাশে ডানা মেলে উড়ছে, তার অমন করুণস্বরে ডাকবার কারণ কি? কবির মনে হ'ল, ওই আকাশচারী বিহঙ্গকে নিতান্ত আধিভৌতিক প্রয়োজনে বার বার মাটিতে নেমে আসতে হচ্ছে ব'লেই সম্ভবত ওর কণ্ঠ থেকে বিলাপ-ধ্বনি নির্গত হচ্ছে।

রূপচাঁদও দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "প্রচুর হাঁস এসেছে দেখছি। একদিন ডাক্‌-রোস্টের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না"

বৈজ্ঞানিক হাসলেন একটু। বললেন, "আমারও এবার ইচ্ছে আছে কতকগুলো হাঁসকে stuff করানো। ট্যাক্সিডারমিস্টের কাছে পাঠাতে হবে।"

হঠাৎ কয়েকটা পাখি অপ্রত্যাশিতভাবে উড়ল এক জায়গা থেকে। গতিটা সরল রেখায় নয়, এঁকেবেঁকে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "স্নাইপ। হিন্দিতে চাহা বলে। এরা শীতকালে আসে। এরা থাকে ইউরোপে আফ্রিকায় কাশ্মীরে। সাইবিরিয়াতেও।" তারপর তিনি বক্তৃতা করতে লাগলেন স্নাইপ কত রকমের আছে।

"সত্যিকার স্নাইপ অনেকে চেনে না, বুঝলেন। Sandpiper বা Snippet গুলোকে স্নাইপ ব'লে মনে করে অনেকে, এরাই প্রচুর ঘুরে বেড়ায় কি না, এ দেশের নদীর ধারে বিলে ঝিলে। প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়। আসল স্নাইপের গায়ের রঙ অদ্ভুত সুন্দর। পাণ্ডুর পিঙ্গল মেটে সাদা বাদামীর অদ্ভুত সমন্বয়। মনে হয়, চমৎকার ছিটের পট্টির কোট গায়ে দিয়ে আছে যেন। ল্যাজের দিকে পাণ্ডুরের সঙ্গে কমলা রঙের আভাস বিশেষ লক্ষণীয়। ঠোঁটটা বেশ লম্বা। কাদা খোঁচাতে হয় কিনা। যে সব পাখিদের খুঁচিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে হয়, তাদের ঠোঁট লম্বা। হুপো দেখেছেন? হুপোর মুখটা যেন একটা গাঁইতি। Sandpiperদের পায়ের পাতা ঈষৎ জোড়া, এদের তা নয়, বুঝলেন, শুনছেন?"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "কাদাখোঁচা নামটা শুনে দ'মে গেলেন বুঝি? কবিতা লেখা যাবে না বোধ হয় এদের নিয়ে"

"তা যাবে না কেন? রূপচাঁদ, তোমার পকেটে কাগজ পেনসিল আছে কি?"

"পকেট-বুক আছে, তাতে পেনসিলও আছে একটা"

"দাও তো"

"ওতে কবিতা লিখবে?"

"ক্ষতি কি!"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কবির দিকে। তারপর পকেট-বুকটা বার ক'রে দিলেন। কবি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা

শুরু ক'রে দিলেন দেখে বৈজ্ঞানিক রূপচাঁদের দিকে মনোনিবেশ করলেন।

"বুঝলেন রূপচাঁদবাবু, স্নাইপদের ল্যাজের আকৃতি অনুসারে এদের আবার ফ্যান-টেল্, পিন-টেল এই দু রকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—"

রূপচাঁদ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "রোস্ট করলে কি স্বাদের কোনও তফাত হয় ?"

বৈজ্ঞানিক হেসে ফেললেন, "না, তা হয় না—"

"তবে শ্রেণীবিভাগ জেনে আর লাভ কি বলুন ! আচ্ছা, ওই দূরে ওগুলো কি বলুন তো ?"

"বক। বকও তিন রকম দেখা যায়, সাধারণত এ অঞ্চলে ইগরেট—"

"ওগুলো চখা বোধ হয়, দেখুন তো"

রূপচাঁদ বিলের অন্য আর একটা দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে দেখালেন।

"হ্যাঁ, ওগুলো চখা। ব্রাহমিনি ডাক্‌স্"

"একদিন আসতে হবে বুঝলেন"

"বেশ তো, ব্যবস্থা করুন না একদিন"

রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, নৌকা বাঁধবার মত সুবিধাজনক কোনও স্থান আছে কি না। বৈজ্ঞানিকও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন যে, জলচর পাখিদের নিজের চোখে যদি পর্যবেক্ষণ করতে হয় তা হ'লে এখানে একটা মাচা বাঁধা দরকার হবে জলের উপর, মাছ ধরবার জন্যে অনেকে যেমন করে। ছোট ডিঙিও রাখতে হবে একটা। দূরবীন দিয়ে দেখতে লাগলেন আবার। মনে হ'ল, টিলও (Teal) আছে—ছোট বড় দু রকমই আছে কি ? রত্নার সঙ্গে আজ গিয়েই পরামর্শ করতে হবে—এখানে কাছাকাছি একটা ছোট ঘর বেঁধে দুজনেই থাকি যদি—

কবি ব'লে উঠলেন, "হয়েছে, শুনুন—

কাদাখোঁচা কাদাখোঁচা
কিসে তুমি কম বা
অঙ্গে আছে তো রঙ
পুচ্ছেতে আছে ঢঙ
নও মোটে খাঁদা বোঁচা
ঠোঁটটি তো লম্বা।
বাইরেতে ধোয়া-মোছা
মেনকা ও রম্ভা
কাদা ঘাঁটে চুপি চুপি
বহু সতী বহু-রূপী ;
—কুন্তী ও অম্বা
না হয় যদি বা ওঁছা
তবে তোর কাদাখোঁচা
কিসের শরম বা !"

নিক ব'লে উঠলেন, "বাঃ ! বেশ হয়েছে"

কবি বললেন, "কবিতা লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হচ্ছিল। উইন্টার ভিজিটার যে কটি দেখলাম—ফুলকি, খঞ্জন, কাদাখোঁচা প্রত্যেকেই ল্যাজ দোলায়—কেন বলুন তো ? আমাদের ছোকরা বাবুরা যেমন বেড়াতে গিয়ে কোঁচা দুলিয়ে বা ছড়ি দুলিয়ে বেড়ায়, এরাও তেমনি বিদেশে বেড়াতে এসেছে কিনা, তাই বোধ হয় ল্যাজ দোলাচ্ছে—"

"না, ঠিক তা নয়"

ঈষৎ হেসে বৈজ্ঞানিক ভাবতে লাগলেন, এর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি রূপচাঁদ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। কবিও চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। শীতের সোনালি রোদ বিলের

কালো জলে লুটিয়ে পড়েছে যেন, আত্মহারা হয়ে উজাড় ক'রে দিচ্ছে যেন নিজের সমস্ত সৌন্দর্য। এক ঝাঁক পাখি—চার পাঁচটা—জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ওগুলো Tern, বাংলায় গাংচিল বলে। আর ওই যে ওপরে শূন্যে পাখা দুটো বিস্তার ক'রে জলের দিকে মাথা নীচু ক'রে আছে ওটা হ'ল মাছরাঙা—Pied King Fisher, White-breasted King fisher ও দেখতে পাবেন এখনই, চমৎকার নীল—বুকে চকোলেটের মাঝখানে সাদা—"

কবি কোনও উত্তর দিলেন না দেখে বৈজ্ঞানিকও চুপ ক'রে গেলেন। একটা নিবিড় নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল সহসা। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

সহসা উৎক্রোশের আক্ষেপধ্বনিটা ভেসে এল আবার। কবি চোখ তুলে দেখলেন, পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে চলেছে বিরাট পাখিটা। কবির মনে হ'ল, ও যেন বলছে—

শুনেছি তাহার স্বর
চিত্ত মোর হয়েছে উধাও
পাখায় করেছি ভর
ছেড়ে দাও মোরে ছেড়ে দাও—

৫

রূপচাঁদ মৌলিক সেদিন স্ত্রীকে একটি রঙিন শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন, আবার এক জোড়া দুল নিয়ে এলেন। আপিস থেকে ফিরে পাকানো চাদরটি গলা থেকে নামিয়ে আলনায় রাখতে রাখতে খুব রহস্যময় দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাইলেন একবার। তারপর আপন মনে

হাসলেন, আর একবার রহস্যময় দৃষ্টিতে চাইলেন স্ত্রীর দিকে, তারপর বললেন, "ভারি দাঁওয়ে একটা জিনিস পেয়ে গেছি আজ—"

স্ত্রী বকুলবালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন, "কি ?"

"তোমার পছন্দ হবে কি, দেখ তো"

দুল জোড়া বার করলেন। পছন্দ যে হবেই, তাতে রূপচাঁদ মৌলিকের সন্দেহ ছিল না। স্ত্রীকে চিনতেন তিনি। বকুলবালার দৃষ্টিতে একটা বিস্মিত আনন্দ ফুটে উঠলেও অনুযোগ-মিশ্রিত ভর্ৎসনার সুরে তিনি বললেন, "আমার দুলের অভাব কি, সেদিনই তো কানপাশা কিনে দিলে এক জোড়া, আবার দুল কিনতে যাওয়া কেন ? তোমার যত সব—"

বকুলবালা ঈষৎ নাচের ভঙ্গীতে আয়নার দিকে ফিরে পুনরায় বেণী-রচনায় মন দিলেন। প্রতিবারই এই ধরনের মেকি ভর্ৎসনা ক'রে থাকেন বকুলবালা। রূপচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হাসিটা গোপন ক'রে কণ্ঠস্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে বললেন, "ওসব বাজে কথা রাখ দিকি, তোমার পছন্দ হয়েছে কি না, তাই বল"

"পছন্দ না হবার কি আছে। কিন্তু কি দরকার ছিল এখন ওসব বাজে খরচ করবার ? সেদিন অত দাম দিয়ে শাড়ি কেনারই বা কি দরকার ছিল ?"

"আমার খুশি আমি বাজে খরচ করব। আমার বাজে খরচ করতে ভাল লাগে"

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "তোমাকে কিনে দেব না তো কাকে কিনে দেব বল তো ?"

ছোট খুকীর মত আবদার-তরল কণ্ঠে বকুলবালা বললেন, "আমার চকোলেট এনেছ ?"

"নিশ্চয়। মর্টনের লজেন্‌জও এনেছি এক শিশি"

"কই দাও—"

রূপচাঁদ কোটের পকেট থেকে লজেন্‌জ এবং চকোলেটের শিশি বার ক'রে দিলেন। পঁয়ত্রিশ-বর্ষ বয়স্কা স্থূলাঙ্গিনী বকুলবালা লজেন্‌জ এবং চকোলেট মুখে পুরে ছোট খুকীর মত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে বেণী দুলিয়ে।

রূপচাঁদ আর একটু হেসে কোটের বোতামগুলি খুলতে লাগলেন নীরবে। এই খুকী-প্রকৃতির স্ত্রীটিকে রূপচাঁদ মৌলিক বুদ্ধিবলে প্রায় খাঁচার মধ্যে বন্দিনী ক'রে রেখেছেন বললেই হয়। খাঁচাটা অবশ্য দেখতে সাধারণ খাঁচার মত নয়। কিন্তু শাড়ি, গয়না, লজেন্‌জ, চকোলেট, মিছে কথা, রাগ-অনুরাগের অভিনয় প্রভৃতি দিয়ে যে পরিবেশ তৈরী করেছেন তিনি, তা বকুলবালাব পক্ষে দুরতিক্রম্য। এই পরিবেশের ওপারে কি আছে তা জানবার পর্যন্ত কৌতূহল নেই তাঁর। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবার ইচ্ছে হয়, এবং সে ইচ্ছে প্রকাশ করবামাত্র রূপচাঁদ মৌলিক নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশে বসিয়ে তাঁকে সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে আসেন। শহরের এমন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, যেখানে আশেপাশে বাঙালী প্রতিবেশী কেউ নেই। বাঙালী প্রতিবেশীদের, বিশেষ ক'রে প্রতিবেশিনীদের, বড় ভয় করেন রূপচাঁদ। তাঁর ধারণা, হিতৈষীর ছদ্মবেশে এঁরা বাড়ির ভিতর ঢুকে হাঁড়ির খবর নেন, তারপর কথায়-বার্তায় ঠারে-ঠোরে আচারে-ব্যবহারে এমন একটা জটিল কুৎসিত ব্যাপার ক'রে তোলেন যে, পারিবারিক শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে যায়। নিজের স্ত্রীকে তিনি কখনও কারও বাড়ি যেতে দেন না, কারও স্ত্রী তাঁর বাড়িতে আসে এ-ও তিনি পছন্দ করেন না। বকুলবালাও করেন না, স্বামীর মতে সায় দিতেই তিনি ভালবাসেন। এইটে রূপচাঁদ মৌলিকের একটা অসাধারণ কৃতিত্ব। বিবাহিত স্ত্রীকে এমনভাবে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ কাজ নয়। এই দুঃসাধ্য কাজ তিনি করতে পেরেছেন দুটো কারণে। প্রথম কারণ, বকুলবালার সঙ্গে বাইরের জগতের কোনও

যোগ নেই, তিন কুলে কেউ নেই তাঁর, ছেলেপিলে হয় নি, হবার সম্ভাবনাও নেই। বিয়ের বছর তিনেক পরে একবার তিনি সন্তান-সম্ভবা হয়েছিলেন, কিন্তু সন্তানটির স্বাভাবিক পরিণতিতে ব্যাঘাত ঘটল। জরায়ুতে না এসে ভ্রূণটি থেকে গেল টিউবে। নিপুণ অস্ত্রোপচারের ফলে প্রাণে বেঁচে গেলেন বকুলবালা কোনক্রমে। কিন্তু তাঁর জরায়ু এবং টিউব কেটে ফেলতে হ'ল। ভবিষ্যতে সন্তান হবার কোনও সম্ভাবনাও রইল না আর। দ্বিতীয় কারণ, বকুলবালা লেখাপড়া জানেন না। সুতরাং রূপচাঁদকে সত্যিসত্যিই বকুলবালার জীবন-সর্বস্ব হয়ে পড়তে হ'ল। বকুলবালার জীবনে রূপচাঁদই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পুরুষ। আর একটি পুরুষ এ বাড়িতে আসে অবশ্য মাঝে মাঝে। রূপচাঁদের সহকারী উমেশবাবুর ছেলে চণ্ডী। স্কুলে পড়ে ছেলেটি। বকুলবালার পাখি দেখতে সে আসে। তারও পাখি পোষার খুব সখ। পাখি দেখবার জন্যে স্কুল থেকেও পালিয়ে আসে সে মাঝে মাঝে। রূপচাঁদ যদিও ব্যাপারটা খুব পছন্দ করেন না, কিন্তু আপত্তিও করেন না তেমন।

রূপচাঁদ কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। পাঞ্জাবি-রুমাল-সর্বস্ব ভদ্রলোক নন, শক্ত সমর্থ পুরুষমানুষ তিনি। নিজের মতে নিজের পথে চলতে পেলে তিনি জীবনে ঠিক কি যে হতেন, তা আন্দাজ ক'রে লাভ নেই। উপস্থিত তিনি হয়েছেন বকুলবালার স্বামী এবং পুলিস সাহেবের আপিসের বড়বাবু! এবং এই উভয়বিধ প্যাঁচোয়া 'পরিস্থিতি'র মধ্যেও স্বকীয় বুদ্ধিবলে নিজের পৌরুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। গৃহে স্ত্রী এবং আপিসে সাহেব দুই-ই তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। জীবনের এই দুটি অনিবার্য বাধাকে নিজের আয়ত্তাধীন ক'রে রূপচাঁদ গোপন পথে নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবনযাপন ক'রে থাকেন—এইটেই বর্তমানে তাঁর বিশেষত্ব।

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে রূপচাঁদ মৌলিকের ধারণাটা কি ধরনের, তা তিনি একবার বহুদিন আগে তাঁর বন্ধু আনন্দমোহনকে লিখেছিলেন।

কলেজ-জীবন থেকেই আনন্দমোহনের সঙ্গে রূপচাঁদের বন্ধুত্ব। মাঝে অনেকদিন দেখাশোনা হয় নি। জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে আবার দুজনের দেখা হয়েছে এখানে অনেক দিন পরে। চিঠিপত্র অবশ্য চলত মাঝে মাঝে। একটা চিঠিতে স্ত্রীলোক-প্রসঙ্গে একবার তিনি লিখেছিলেন, দেখ ভাই আনন্দমোহন, স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে তোমার মনোভাবটা কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'ল। আমার মতবাদ ( দর্শনও বলতে পার ) ও বিষয়ে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। চুনি, পান্না, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মণিমাণিক্যের সঙ্গে নারীর নামও করা উচিত। রমণী সত্যই রত্ন-বিশেষ, রত্ন-শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাকে নিয়ে নানারকম কবিতা লিখতে পার, আপত্তি করব না ; কিন্তু একটি কথা ভুলো না যে, রত্নের মতই তাকে আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এই আহরণের এবং রক্ষণাবেক্ষণের নানা পদ্ধতি মানুষ যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে। কখনও তাকে প্রহার করেছে, কখনও হারেমে পুরেছে, কখনও দাসী বানিয়েছে, কখনও দেবী বলেছে, কখনও তার স্বাধীন সত্তার গুণগান ক'রে স্বাধীনতা দেওয়ার নামে শত সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে, কখনও ছিনিয়ে এনেছে, কখনও বিবাহ করেছে, কখনও কবিতা লিখেছে—কত রকম করেছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—আহরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ। প্রেমের কবিতার জন্মও হয়েছিল বোধ হয় ওই একই.কারণে। ভারি মনোরম ফাঁদ ওটি, সকলে যদিও ফাঁদ পাততে জানে না। তোমার ও কৌশলটা জানা আছে, কিন্তু ওটি ফাঁদ মাত্র—এই কথাটি মনে রেখো। ওটা নিয়েই দিশাহারা হয়ে প'ড়ো না, কারণ ওটা মীনস্ (means), এণ্ড (end) নয়। যখন তখন আত্মহারা হয়ে তুমি বেসামাল হয়ে পড়, তাই তোমায় বন্ধুভাবে কথাটা বললাম। যদি অবধান কর, অনেক বাজে বখেড়ার হাত থেকে রেহাই পাবে।

বলা বাহুল্য, আনন্দমোহন অবধান করেন নি, কারণ তিনি ভিন্ন জাতের লোক।

প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে স্ত্রী-রত্নবিষয়ক এবম্বিধ জহুরীর কোষাগারে বকুলবালারূপ অমূল্য রত্ন এসে যখন কায়েমী আসন গেড়েছিল, তখন রূপচাঁদ প্রথমটা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন বটে; কিন্তু একটানা ঘাবড়ে থাকবার লোক তিনি নন। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্যকরূপে খাপ খাইয়ে নিজের তরী নানা ঘাটে ভিড়িয়ে এসেছেন তিনি এতকাল অসামান্য দক্ষতাসহকারে। বকুলবালা একা যে তাঁর পারুষ্যের ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম, এই সত্যটি বকুলবালার কাছ থেকে গোপন করতে না পারলে তাঁর ক্ষুধা যে অতৃপ্তই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত—এ কথা বিবাহের কিছুদিন পরেই বুঝেছিলেন তিনি। বিবাহিতা স্ত্রীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এমনই নিখুঁত ছিল যে, বিদ্রোহ করার কল্পনাও তিনি করেন নি। বরং ঠিক উলটো পথই ধরেছিলেন। বকুলবালা এবং নিজের ক্ষুধার মাঝখানে যে গোপনতার জাল তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার প্রায় পনেরো আনাই বকুলবালা-আরতি। বকুলবালার অজস্র প্রশংসা ক'রে, তাঁকে অযাচিত উপহার কিনে দিয়ে রূপচাঁদ তাঁর সচেতন মানসের চতুর্দিকে যে রঙিন কুয়াশা সৃজন করেছিলেন, তা ভেদ ক'রে সত্যের সন্ধান করবার মত তীক্ষ্নদৃষ্টি বকুলবালার ছিল না। বকুলবালার নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, স্বামী তাঁর এবং একান্তই তাঁর। এত সাবধানতা সত্ত্বেও বায়ু-বাহিত বীজের মত দু-একটা উড়ো খবর কুয়াশাজাল ছিন্ন ক'রে মাঝে মাঝে বকুলবালার কর্ণকুহরে যে না ঢুকত তা নয়; কিন্তু রূপচাঁদ এমন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রেখেছিলেন যে, সেই উড়ো খবরের বীজ বকুলবালাব মনে বিষবৃক্ষে পরিণত না হয়ে অমৃতবৃক্ষেই রূপান্তরিত হ'ত। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে না-জানি কি রহস্যময় একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাঁকে দেখা-মাত্রই অধিকাংশ স্ত্রীলোক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং চেষ্টা করে তাঁকেও আকৃষ্ট করতে। কিন্তু বকুলবালার মত স্ত্রী ঘরে থাকতে—হুঁঃ! বকুলবালা গদগদ হয়ে পড়তেন। তিনি কল্পনা করতেন, অদৃশ্য একটা

যুদ্ধক্ষেত্রে রূপচাঁদ অহরহ যেন যুদ্ধ করছেন এবং প্রতিবারই জয়ী হচ্ছেন। সবাই তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণ করছেন না। বকুলবালা-প্রেমবর্মে আচ্ছাদিত থাকাতে কেউ কিছু করতে পারছে না তাঁর। নিজের স্বর্গে সুখেই ছিলেন বকুলবালা।

জলযোগান্তে মৃদু হেসে রূপচাঁদ বললেন, "আবার এক ফ্যাসাদে পড়া গেছে বুঝলে ?"

"কি ফ্যাসাদ ?"

"বার্মা-ফেরৎ একটা মেয়ে এসে জুটেছে। শুধু জোটে নি ঘাড়ে পড়েছে।"

"বার্মা-ফেরৎ মেয়ে ? বার্মা কোথায়, কতদূর এখান থেকে ?"

স্মিতমুখে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ। সহধর্মিণীর বিরাট অজ্ঞতায় চমকে গেলেন একটু মনে মনে। সুখীও হলেন পরমুহূর্তে।

"বার্মা অনেক দূর। মগের মুলুক। সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে আজকাল। জাপানীরা বোমা ফেলছে।"

"ও !"—চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল বকুলবালার।

"সেই বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটি। পথে বাপ ভাই মা বোন—সব ম'রে গেছে। জুটেছে এখানে এসে। অমরেশের বাসায় আছে। অমরেশ কেন যে এসব জোটায় ! এখন আমাকে বলছে—তুমি ভাই, সব ঠিক ক'রে দাও ওর।"

"তুমি কি ঠিক ক'রে দেবে ?"

"বাস-টাসা, দাই-চাকর—এই সব আর কি। আমি অমরেশকে বললাম, তুমি নিজের বাসায় ঠাঁই দিয়েছ, বাকিটুকু তুমিই কর না। কিন্তু ও তা শুনবে ! না-ছোড় লোক। আমাকে বলছে—তুমি পুলিসের লোক, তুমি সহজে ব্যবস্থা করতে পারবে। দেখ দিকি কি আপদ !"

স্বামী-গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বকুলবালার মুখ।

"আহা, ক'রেই দাও না! বিদেশে বিভুঁয়ে এসে কষ্টে পড়েছে বেচারী। বাপ-মা সব ম'রে গেছে?"

"সব"

"বিয়ে হয় নি?"

"না"

"আহা! দাও একটা ব্যবস্থা ক'রে"

"মেয়েমানুষ কিনা! এখনই চট ক'রে কে কি ব'লে বসবে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, আনন্দকে দিয়ে তোমার মুনিয়া পাখির বিষয়ে ছোট্ট একটা ছড়া লিখিয়ে এনেছি"

"সত্যি?"

নূতন খেলনার লোভ দেখালে শিশুর চোখ দুটো যেমন আনন্দে আগ্রহে জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে, বকুলবালারও তেমনই উঠল।

"কই, পড় না শুনি"

বকুলবালার সময় কাটাবার জন্যে নানারকম পাখি কিনে দিয়েছেন তাঁকে রূপচাঁদ। টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, ময়না, শ্যামা, মুনিয়া। এই সূত্রেই অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। তাবপর আলাপ অবশ্য গাঢ়তর হয়েছে। পাখির সম্বন্ধে যতটা না হোক, অমরেশবাবু লোকটির সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। প্রাক্তন বন্ধু আনন্দও এসে জুটে যাওয়াতে জ'মে উঠেছে ব্যাপারটা। কবিকে দিয়ে কবিতাটা অনেকদিন আগেই লিখিয়ে রেখেছিলেন তিনি। এখন তাক মাফিক কাজে লাগালেন।

"কই, পড়—"

"দাঁড়াও সিগারেটটা ধরাই আগে"

ধীরে-সুস্থে সিগারেটটা বার করলেন। ধীরে-সুস্থে ঠুকলেন সেটাকে টেবিলের উপর, ধীরে-সুস্থে দেশলাই-কাঠিটি বার ক'রে ধরাতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বকুলবালার তর সইল না আর। হাত থেকে

দেশলাইয়ের বাক্সটা কেড়ে নিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বললেন, "না, তুমি পড় আগে"

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেললেন রূপচাঁদ। এইই তিনি চাইছিলেন। বকুলবালার মনটা যেদিকে যখন ঝোঁকে, সেই দিকেই তখন ছোটে অবিলম্বে। অন্য দিকে তখন ফিরে চায় না, ফেরবার সামর্থ্য থাকে না। হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা ছবি মনে পড়ল রূপচাঁদের। এই ছবিটা প্রায়ই মনে পড়ে তাঁর। বকুলবালা-চরিত্রের একটা ভয়ঙ্কর দিক আবিষ্কার করেছিলেন সেদিন তিনি। ঈর্ষার প্ররোচনায় বকুলবালা যে খুন পর্যন্ত করতে পারে, এ কথা তার আগে কল্পনাতীত ছিল রূপচাঁদের। বকুলবালা সত্যিই খুন করেছিলেন। অবশ্য মানুষকে নয়, একটা রামছাগলকে। অনেক দিন আগে একটা রামছাগলের ছানা কিনে দিয়েছিলেন তিনি বকুলবালাকে। কিন্তু রামছাগলটা তাঁরই বেশী ন্যাওটো হয়ে পড়ল কোনও অজ্ঞাত কারণে—সম্ভবত, তার পরমায়ু ফুরিয়েছিল ব'লে। তিনি যখন আপিস থেকে আসতেন, তখন সেটা তাঁরই আশে পাশে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াত। বকুলবালা ডাকলেও তাঁর কাছে যেত না। তখন শীতকাল একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি, রামছাগলটা তড়াক ক'রে এসে বিছানায় উঠল এবং যে জায়গাটায় বকুলবালা শোন, সেই জায়গাটায় বসল এসে বাগিয়ে। লম্বা লম্বা কান দুটি নেড়ে সরল চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা ভাষা ফুটিয়ে তুলল, যার অর্থ—রূপচাঁদের মনে হ'ল—লেপটা জড়িয়ে দাও না আমার গায়ে। রূপচাঁদ লেপটা জড়িয়ে দিলেন তার গায়ে। সে আরও গুটিসুটি হয়ে ঘেঁষে এসে বসল। কিছুক্ষণ পরেই এলেন বকুলবালা—এবং যেমন তাঁর প্রাত্যহিক রীতি—ছেলেমানুষের মতো হুড়মুড় ক'রে বিছানায় উঠে রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন—

"এ কি, লেপের তলায় এ কে ?"

"ছাগলটা এসে ঢুকেছে"

"বেরো, বেরো, বেরো পোড়ারমুখো"—হিড়হিড় ক'রে টেনে সেটাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। রূপচাঁদ প্রত্যাশা করছিলেন, ছাগল-টাকে বার ক'রে দিয়ে বকুলবালা তখনই আবার ঢুকবেন লেপের তলায় এসে। কিন্তু বকুলবালা ফিরলেন না। কয়েক মিনিট পরে আর্তকণ্ঠের একটা 'ব্যা' শব্দ শুনে উঠতে হ'ল রূপচাঁদকে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন, বকুলবালা মাছ-কাটা বড় বঁটিটা দিয়ে ছাগল-ছানা-টাকে কাটছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগুন, মাথার কাপড় স'রে গেছে, কুন্তল আলুলায়িত। সে এক ভয়াবহ মূর্তি! ঈর্ষাপীড়িত হ'লে বকুলবালা যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন, সেই দিন চকিতের মধ্যে বুঝেছিলেন তিনি, আর সেই দিন থেকে মনে মনে ভয়ও করেন তিনি তাঁকে।

"পড় না ছড়াটা!"

রূপচাঁদ মনিব্যাগের ভিতর থেকে কাগজের টুকরোটি বার ক'রে প'ড়ে শোনালেন—

মুনিয়া রে মুনিয়া,
কথা যা রে শুনিয়া
গায়ে ক'টা ফোঁটা আছে
আয় দেখি গুনিয়া।
পতঙ্গ ধরিয়াছে পক্ষীর বেশ কি
ছটফটানির তোর নেই আর শেষ কি
সারা গায়ে অপরূপ রেশমের গালচে
কখনও সবুজ রঙ কখনও বা লালচে
কখনও পান্না তুই
কখনও বা চুনিয়া
মুনিয়া রে মুনিয়া।

কবিতা শুনে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো। ভাল ক'রে লিখে দাও তুমি একটা কাগজে, খাঁচাটার গায়ে সেঁটে রাখব"

"আচ্ছা, সিগারেটটা খেয়ে নিই, দাঁড়াও"

"না, আগে লেখ তুমি"

রূপচাঁদ চেয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। অবুঝ শিশুর দৃষ্টি চোখের চাহনিতে।

"তুমি আনন্দবাবুকে ব'লে আমার মদনলাল, যমুনা আর সোহাগীর নামেও ছড়া লিখিয়ে এনো, কেমন? প্রত্যেকের খাঁচার গায়ে সেঁটে দেব, বেশ?"

রূপচাঁদ স্ত্রীকে চিনতেন। বাগ্‌বিতণ্ডায় আর সময় নষ্ট না ক'রে লিখতে শুরু করলেন ছড়াটা। বকুলবালা উন্মুখ আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগলেন।

৬

কবি একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেদিন আপন মনে। অমরবাবু রূপচাঁদ কেউ সঙ্গে ছিলেন না। ভোরে উঠেই দুজনে কোথায় যে বেরিয়ে গেছেন, তা বলতে পারলে না কেউ। রত্নপ্রভা বললেন, "পাশের গ্রামে কোনও পাখিওলার কাছে গেছেন সম্ভবত—"

কবি একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিছুদূর গিয়ে নজরে পড়ল, সজনে গাছে ফুল ধরেছে। গোছা গোছা সাদা সাদা ফুল। আর একটু এগিয়ে গেলেন—পাতাগুলোও কি চমৎকার! আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, চাকুন্দা গাছে লম্বা লম্বা শুঁটির মত ফল ধরেছে। কিছুদিন আগেই হলদে হলদে ফুলের গোছায় ভরতি ছিল সব। এখনও ফুল আছে দু-চারটে, কিন্তু ফলের সংখ্যাই বেশি। শুভ্র সুন্দর ধুতরো

ফুলগুলোও আর নেই, কণ্টকিত ফল দেখা দিয়েছে। একটা কথা মনে পড়তেই এগিয়ে গেলেন তিনি। একটু দ্রুতপদেই গেলেন। কিছুদিন আগে একটা ঝোপের মধ্যে ঘন বেগুনী রঙের ফুলের ছড়া দেখেছিলেন। বড় বড় দুলের মত দুলছিল যেন বন-লক্ষ্মীর অলক-গুচ্ছে। গিয়ে দেখলেন, একটিও নেই, তার জায়গায় সিম ঝুলছে গোছা গোছা। মনে হ'ল, শীতের সময় যে সব ফুলের দল এসেছিল চ'লে গেছে তারা। মনে পড়ল, বাগানে রঙ্গর্ন কুন্দর গাছে যে মহোৎসব পড়েছিল কিছুদিন আগে, তাও আর নেই। ফুটছে বটে দু-চারটে ফুল, কিন্তু জোয়ার নেবে গেছে। স্থলপদ্মও ফুটছে না আর। জবাও খুব কম। গাঁদা আর বিদেশী মরশুমী ফুলেদেরই ভিড় এখন। শীতকালে যেমন এক দল বিদেশী পাখি আসে আবার চ'লে যায়, তেমনিই এক দল ফুলও আসে আবার চ'লে যায়। বিদেশী পাখিরা চ'লে যায়, কিন্তু রেখে যায় কি কিছু? যায় কি না জানা নেই। শীতের ফুলেরা ফল রেখে যায়, কিন্তু কোথায় যায় ওরা? তাও জানা নেই। ফুলই ফলে পরিণত হয়—এ বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে মন যেন মানতে চায় না। বরং ভাবতে ভাল লাগে যে, দু জাতের জিনিস ওরা। এক দল আসে আর একদল চ'লে যায়। এক দলের কত ব্য শেষ হয়, শুরু হয় আর এক দলের। প্রথম দলই দ্বিতীয় দলে পরিণত হয়—চুল-চেরা হিসেব ক'রে ঠিক করেছে যারা, তারা বেনে। হিসেবটাও নিখুঁত নয় সব সময়ে। তবু ছাড়বে না, তর্ক করবে। হিসাবের খুঁটিনাটিতে মত্ত হয়ে কি ক'রে যে দিন কাটায় ওরা! না, হিসাব নিয়ে মাথা-ঘামানো কবির কাজ নয়। প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না। যে আবির্ভাব সমস্ত সত্তাকে উতলা ক'রে তোলে, তার সত্য রূপ হিসাব ক'রে দেখা যায় না, দেখা যায় কবির দৃষ্টি দিয়ে···এই ধরনের খাপছাড়া ভাবনা ভাবতে ভাবতে আপন মনে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি।

···হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, শহরের বাইরে অনেক দূর এসে পড়েছেন। খাতা পেন্সিল সঙ্গে এনেছিলেন। অনেক কবিতার

লাইন মনে আসে, কিন্তু হারিয়ে যায়। এবার থেকে টুকে রাখবেন ঠিক করেছেন। ওরা যখন কেউ সঙ্গে নেই আজ, আপন মনে কবিতাই লেখা যাবে কোথাও ব'সে। একটা আমবাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি। দেখলেন, একটা গাছের তলায় রোদ এসে পড়েছে বেশ। নিজের র‍্যাপারটা বিছিয়ে তার উপর বসলেন। মনে হ'ল, মন্দাকিনী দেখলে কুরুক্ষেত্র করতেন। মুচকি হাসলেন একটু।

···দূরে নদীর চর দেখা যাচ্ছে। সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন। মাঝে মাঝে সরষে ফুল। বিরাট একটা সবুজ মখমলের গালিচায় সোনার চুমকি জ্বলছে অজস্র। এক ঝাঁক পাখি এসে বসল সামনের গাছটায়। ব'সেই আবার উড়ল। আবার বসল আর একটা গাছে। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। দেখে চিনতে পারলেন। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছেন সেদিন। এ দেশে 'পাওয়াই' বলে। ময়না এক জাতের। ইংরেজী নাম Grey-headed Myna। মাথা পিঠ ধূসর রঙের, পেটের তলা বাদামী, ঠোঁটটি কালচে গোছের। শীতকালে আসে। কবির মনে হ'ল, মানুষদের মধ্যেও এক জাত আছে, যারা ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে—সন্ন্যাসীর দল, বেদুইনের দল। তারা মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দেখা দেয়, হয় ভিক্ষা করতে, না হয় রাহাজানি করতে। এ পাখিগুলোও তেমনই বোধ হয়। পাওয়াই নাম না দিয়ে বেদুইন নাম দিলে বোধ হয় বেশি মানায়। আর একবার তাঁর মনে হ'ল, আমাদের ভাষায় সব পাখির নাম সুন্দর নয়। নূতন নামকরণ করা উচিত। আবার উড়ল ময়নার দল। উড়ে চ'লে গেল দৃষ্টির ওপারে। কোনও চিহ্ন আর রইল না তাদের। কবির মনে জাগল কবিতা—

আকাশেতে ওড়ে নিশি
ওড়ে কত দিন

ওড়ে পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে
শকুনি সারস কাক,
অদৃশ্য ঘোড়া চ'ড়ে
ওড়ে বেদুইন
কিন্তু আকাশে কোনও
থাকে না তো চিন্।
উড়ে সব চ'লে যায়
চিহ্ন থাকে না হায়
চেয়ে থাকে মহাকাল
শান্ত প্রবীণ
নির্মল মহাকাশ
নাই কোন চিন্।

চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে উঠল যেন চারিদিকে। অনামা শব্দ, অজানা গন্ধ, চকিত স্পর্শ… তার ওপার থেকে পরিচিত জগতের টুকরো টুকরো খবর ভেসে আসছে। দূরে ঘুঘু ডাকছে করুণ সুরে। কুটুর কুটুর ক'রে বুলবুলিরা ডাকছে মাঝে মাঝে পাশের ঝোপটায়। আবার নীরব হয়ে গেল সব। আবার চোখে ভেসে উঠল দূর দিগন্তের মায়া-মরীচিকা—হ্যাঁ, যদিও সবুজ, তবু মরীচিকাই—কাছে গেলে থাকে না। দূর থেকে প্রলুব্ধ করে শুধু…হঠাৎ চোখে পড়ল, সামনের কলকে ফুলের গাছে কোকিল ব'সে আছে একটা। এতক্ষণ দেখতে পান নি। দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন। কুচকুচে কালো পালক। কালো গরদ যেন। সবুজ ঠোঁট। লাল চোখ। চুপ ক'রে ব'সে আছে গুটিসুটি হয়ে। কবির মনে হ'ল, ধ্যান-মগ্ন। মনে হ'ল, ও কোকিল নয়—আলোক-পিপাসী অন্ধকার। অমানিশার টুকরো একটা। পালিয়ে এসেছে আলোর দেশে।

পিক-রূপে অন্ধকার আলোর তপস্যা করে
আলো চায় কালো,
চঞ্চুতে সবুজ-স্বপ্ন, নয়নে অনল-ভাতি
বলে—আলো জ্বালো,
হে দেবতা, জ্বালো আলো—সপ্তবর্ণ-সম্মিলন-ভাতি—
দূর হোক অন্ধকার ছুর্বিষহা ভয়ঙ্করী রাতি
অবারিত হোক দৃষ্টি জীবনেতে জাগুক প্রভাতী
আলো দাও আলো—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক ক'রে উঠল কে যেন। কবি চেয়ে দেখলেন, পাশের গাছটা থেকে উড়ে গেল জংলা-শাড়ি পরা কোকিলা। ওর সঙ্গিনী বোধ হয়। পরমুহূর্তেই কোকিলও উড়ে গেল। তপোভঙ্গ হ'ল তার। দূরে কোমল মধুর কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল তার মিনতি—কুক্, কুক্, কুক্, কু—

খাতা পেন্সিল প'ড়ে রইল ঘাসের উপর। সামনের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন কবি। এক ঝাঁক সবুজ টিয়া বসল সামনের বকুল গাছটায়। দূর-দিগন্তের সবুজ মরীচিকাই নবরূপে ভোলাতে এল নাকি তাঁকে? নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন তিনি। হ্যাঁ, সমস্ত মরীচিকাই। ডানার কথা মনে পড়ল সহসা। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন খানিকক্ষণ। কল্পনালোকে ঘন অরণ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন যেন। সমস্ত চিত্ত জুড়ে একটি কথাই বাজতে লাগল কেবল—হোক মায়া, হোক মরীচিকা, তবু সুন্দর। কালই যে কবিতার ছুটো লাইন এসেছিল তাঁর মনে কিন্তু যা তিনি শেষ করেন নি, সেই ছুটো লাইনই গুনগুন ক'রে এল আবার—

ভ্রমর আসিয়া কানে কানে কহে কুন্দর
তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর।

এল, আবার চ'লে গেল। শেষ করতে ইচ্ছে হ'ল না। মনে হ'ল, অসমাপ্ত জিনিসেরও না-বলা বাণী আছে একটা। তা অব্যক্তরূপেই বিকশিত। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। যে রোদের ফালিটা পিঠের উপর ছিল এতক্ষণ কোলের উপর পড়ল সেটা এসে। দুষ্ট ছেলে যেন একটা। এতক্ষণ পিঠের উপর ঝুলছিল, কোলে এসে বসল এবার। আলোক-শিশু। কোথা থেকে এল এ? গাছের কোন্ ফাঁকটা দিয়ে এল দেখতে গিয়ে আর একটা জিনিস চোখে প'ড়ে গেল। অমরবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। চোর-পাখি। দূরবীন তুলে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন। পেটের তলাটা বাদামী, অনেকটা আরশোলার মত রঙ। পিঠের রঙটা ইঁদুরের মত। ছোট্ট চৌকোণা ল্যাজটি। ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ডালটা ঠোকরাচ্ছেও কাঠঠোকরার মত। বাঃ, হঠাৎ কেমন ঘুরে গেল ডালের নীচের দিকে! খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি খাতা পেন্সিল তুলে নিলেন।

আরশোলা-রঙ পেটের তলায়
ইঁদুরের রঙ পিঠে
তবু গাই তার জয়
নামটা তাহারে বঙ্গবাসীরা
দেয় নি যদিও মিঠে
তবু সে তুচ্ছ নয়।

আকাশের সাথে মিতালি যে তার
মেলতে জানে সে ডানা
করে না সে চাকৃরি তো
পাশাপাশি ব'সে কাঠঠোক্‌রার
খায় সে পোকার খানা
সরল স্বোপার্জিত।

চোরা-বাজারের সঙ্গেতে তার
নেই কোনও পরিচয়
চেনে না কালো-বাজার
ডালে ডালে শুধু হামাগুড়ি দেয়
পাতায় পাতায় নয়
আমি জয় গাই তার।

আমার কাব্যে চোরা-পাখি তুমি
চতুরিকা চঞ্চরী
গোপন-সঞ্চারিণী
অদৃশ্য পথে আনাগোনা কর
অন্তর মন ভরি'
আমি যে তোমারে চিনি।

কবিতাটা শেষ ক'রে কবি আবার চেয়ে দেখলেন উপরের দিকে। চ'লে গেছে চতুরিকা পাখি। ওরা থাকে না, চলে যায়। আসা আর যাওয়া ছুটোই সত্য। পাওয়া আর হারানো, মিলন আর বিরহ, অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে বিশ্বকবির ছন্দে। আমরা একটাকে আঁকড়ে ধরি, অন্যটাকে মানতে চাই না। তাই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাই বার বার। হাহাকার ওঠে জগৎ জুড়ে।

"কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক'—আর্তস্বরে হাহাকার ক'রে উঠল কে যেন! কবি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, আর একটা পাখি। অচেনা পাখি। উঠে পড়লেন। দূরের উঁচু ডালটায় বসল। দূরবীন দিয়ে দেখলেন ভাল বোঝা গেল না। এগিয়ে গেলেন একটু। এবার দেখা গেল। নূতন ধরনের শ্রাইক (Shrike) নিশ্চয়, কারণ চোখের উপর কালো টানা রয়েছে। "কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক, কোঁইঅ্যাক"—চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল আবার পাখিটা। দূরের একটা গাছে

গিয়ে বসল। সেখান থেকে উড়ল দুটো পাখি। সঙ্গী পেয়ে গেল বোধ হয় প্রথমটা।

কুড়ুরুক, কুড়ুরুক, কুড়ুরুক। বসন্ত-বউরি ডাকছে, টংক টংক টংক—ডেকে চলেছে ভগীরথ। তার সঙ্গে জাল বুনে চলেছে ঘুঘুর করুণ সুর। কয়েকটা চিল ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার উপর মন্থরগতিতে। অদ্ভুত পরিবেশ! বিহ্বল কবি ব'সে পড়লেন একটা ঝোপের ধারে। বাঁশ-পাতি পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন বাঁশের পাতা। ছিপছিপে দেহ, আর পাতলা সবুজ রং। দূরবীন দিয়ে দেখলেন, শুধু সবুজ নয়, ঈষৎ হলুদেরও আমেজ আছে। নীলেরও আভাস আছে মুখের কাছটায়, বিশেষত গলায়। ঘাড়ের কাছে সোনালি। চোখের কাছে কালো, গলায় কালো কণ্ঠি, চোখ লাল, ঠোঁট কাল। ল্যাজের থেকে লম্বা সরু পালক বেরিয়ে এসেছে একটি। রূপসী। হঠাৎ মনে হ'ল দুটো লাইন—

ফলের মধ্যে নাসপাতি
পাখির মধ্যে বাঁশ-পাতি।

তখনই মনে হ'ল, মিলের জন্যেই লাইন দুটো মনে এল নাকি? নাসপাতির সঙ্গে সত্যি সত্যি কিছু কি মিল নেই ওর কোনখানে? আছে বইকি। রঙের মিল তো অনেক আছে। স্বভাবেরও মিল আছে হয়তো। ছিপছিপে চটুলা কিশোরীর মত দেখতে, স্বভাবও হয়তো অম্লমধুর। কবিতাটা আর একটু বাড়াবেন কি না ভাবছিলেন, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আর একজন। সামনে ছোট্ট একটা ডাল হাওয়ায় দুলছে। ডালের উপর ওটা কি? নাচছে নাকি? বাঃ, চমৎকার তো! মনে পড়ল বইয়ে ছবি দেখেছিলেন। অমরবাবু বলেওছিলেন এর কথা। কুলো পাখি নিশ্চয়। না হয়ে যায় না। ছোট্ট পাখিটি, চড়ুই পাখির মতন। দূরবীনে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে ব'সে রইলেন মুগ্ধ হয়ে। বাঃ, নাচের কি বাহার! উড়ে গেল। খাতা খুলে ব'সে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

হাওয়ার দোলে বাহা বাহা
ছোট্ট শাখী
ফুরফুরিয়ে
উঠছে দুলে,

তার উপরে নাচছে আহা
ছোট্ট পাখি
ল্যাজ ঘুরিয়ে
প্যাখম তুলে।

আলোয় মাখা সবুজ ডালে
আপন মনে নাচছে তালে
পালকগুলি যাচ্ছে ঘুরে
প্রাণের সুরে গানের সুরে
সকল ভুলে।

চোখের উপর কি সুন্দরই
মরি মরি
চন্দনেরি
তিলক শোভে,

ওড়নাখানা তার পোষাকী
পরল নাকি
চড়াই পাখি
নাচের লোভে!

কালচে রঙে সাদার ছিটে
মানিয়েছে বেশ লাগছে মিঠে
পুচ্ছ-পাখার বাহার দিয়ে
হচ্ছে মনে লাফিয়ে গিয়ে
আকাশ ছোঁবে।

বুঝবে না তো আকাশ-ছোঁবার অর্থ কি, ও

কুলো পাখি ? মিথ্যা কথা, নর্তকী ও।

কবিতা শেষ হতে না হতেই আর একটা তীক্ষ্ণ-মধুর ডাকে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। ঢেউ-খেলানো তীক্ষ্ণ মধুর একটানা ডাক একটা। সুরের 'গ্রাফ' (graph) যেন এঁকে-বেঁকে মূর্ত হচ্ছে শ্রুতি-লোকে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। ঘাড় তুলে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন নীল রঙের পাখিটাকে। চিনতে পারলেন। মাছরাঙা। White-breasted King Fisher। তখনই মনে হ'ল—পক্ষীবিদ্‌রা এর সাদা বুকটাকেই এত প্রাধান্য দিয়েছেন কেন ? গায়ে তো ওর রঙের অভাব নেই ? খাতা খুলে আবার শুরু করলেন কবিতা।

বাজাই তোমার রূপের ডঙ্ক

হে বর্ণাঢ্য মৎস্য-রঙ্ক,

ধন্য হয়েছে তোমারে পাইয়া

খাল বিল নদ নদীরা,

পক্ষীবিদেরা করেছে লক্ষ্য

কেবল তোমার শুভ্র বক্ষ

জানি না কেন যে দেখে নি চাহিয়া

তব লাল-নীল-খদিরা।

কবির চক্ষু বর্ণ মগ্ন

স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবল স্বপ্ন—

মাতায়ে তুলেছে উন্মুখ হিয়া

বর্ণ-বহুল মদিরা,

ভেসেছে মনের ময়ূরপঙ্খী

কার সন্ধানে সে নিঃশঙ্কী

অজানা নদীতে উজান বাহিয়া

চলেছে উতলা অধীরা।

পাখিটা উড়ে চ'লে গেল। কবি ভাবতে লাগলেন, ওর 'হোয়াইট-ব্রেস্টেড্' নাম হ'ল কেন? অমরবাবু কাছে থাকলে হয়তো একটা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কবির মনে হ'ল, সেকালে পক্ষীবিদেরা পাখি মেরে মেরে পক্ষী-বিজ্ঞান চর্চা করতেন। ওর ধপধপে সাদা বুকটায় বন্দুকের তাক করবার সুবিধে হ'ত ব'লেই বোধ হয় ওই নাম দিয়েছিলেন তাঁরা। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। শিস দিলে কে? পাখি? একটা পাখি নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে চলতে লাগলেন নদীর দিকে। প্রায় ছুটতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, কি একটা হাতছাড়া হয়ে গেল যেন। নাগালের বাইরে চ'লে গেল চিরদিনের মত। কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কিন্তু। মাঠে ছোট ছোট মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দু পড়ে ছোট ছোট মুক্তোব জালের মত হয়েছে, চারিদিকে ছড়ান রয়েছে অজস্র। প্রখর দিবালোকে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত একটা কথা মনে হ'ল তাঁর। এই নির্জন প্রান্তরে কাল রাত্রে দেবকন্যারা আসে নি তো? লাস্যলীলা-অবসানে চ'লে গেছে হয়তো ভোরবেলা। ফেলে গেছে তাদের কবরীর জালাবরণ। যে পাখিটাব অনুসবণ ক'রে একটু আগে চলছিলেন, তার কথা ভুলেই গেলেন। সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা হেঁট ক'বে চললেন নদীর দিকে। মিষ্টি মিহি আর একটা সুর শুনে একটু পরেই কিন্তু উপরের দিকে চাইতে হ'ল আবার। একদল কালো কালো ছোট ছোট পাখি উড়ছে। দূরবীন দিয়ে দেখেই চিনলেন। কমন সোআলো (Common Swallow)। এর সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন অমরবাবু। এদেরই সম্বন্ধে বোধ হয় সেই পাদরি বৈজ্ঞানিক গিল্‌বার্ট হোয়াইট বলেছিলেন যে, এরা শীতকালে কাদার নীচে চ'লে যায়। আসলে কিন্তু শীতকালে এরা এ দেশে আসে। ও দেশে থাকে গ্রীষ্মকালে। ইংরেজী প্রবাদটাও মনে পড়ল—One swallow does not make a summer। দূরবীন দিয়ে দেখলেন আবার। ল্যাজটা অনেকটা ফিঙের মত, পেটের কাছে সাদাটে, গলার নীচেটা

বাদামী, পিঠটা কুচকুচে কালো, ছোট্ট ঠোঁট, মুখটি সুন্দর। দেশী নাম আবাবিল। কি চঞ্চল! এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। আবার একটা কবিতা জাগল মনে। অন্তরলোকে কবিতার প্রস্রবণ বইছে আজ। খাতা আর বার করলেন না। মনে মনেই চলল রচনা।

শীতের অতিথি আবাবিল,
নূতন আকাশে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘুরে ঘুরে দেখে খাল বিল,
গ্রাহ্য করে না আশে পাশে ওড়ে
শকুনি গৃধিনী কাক চিল,
কি চায় কি চায় ঠিকানা না পায়
বিশ্রাম নেই এক তিল,
শীতের অতিথি আবাবিল।

ডানার কথা মনে পড়ল। ও মেয়েটিও তো অতিথি এ দেশে। ওর মনও কি চঞ্চল হয়ে উঠে নি এই আবাবিলদের মত? হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। খঞ্জন, ফুলকি, কাদাখোঁচা, আবাবিল, উৎক্রোশ, সকলেই কেমন যেন উন্মনা অস্থির, কি যেন খুঁজছে সবাই। ডানা কি চুপ ক'রে আছে? কি খুঁজছে ও? কাকে খুঁজছে? কি ভাবে খুঁজছে? ওর কালো চোখের দৃষ্টিতে যে আলোর ঝলক দেখেছিলেন সেদিন, তা ভাষা-ভরা কিন্তু তার অর্থ কি? কবির সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল, কাঁপতে লাগল ছন্দভরে। পরমুহূর্তেই নূতন একটা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'ল কিন্তু। সামনে সাঁকো একটা। অত্যন্ত অপলকা ব'লে মনে হ'ল। কয়েকটা বাঁশ আর তক্তা দিয়ে তৈরী। আস্তে আস্তে খুব সন্তর্পণে পার হলেন। পার হয়েই সবুজের রাজ্য। গম যব ছোলার ক্ষেত। ও কিসের শব্দ? ভারি মিষ্টি তো! উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার শব্দ হ'ল। কোন্ পাখি এ? এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, কিছুই দেখতে পেলেন না। একজন চাষাকে দেখা গেল

দূরে। কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তাকেই প্রশ্ন করলেন, "কি পাখি ডাকছে বলতে পার ?"

"ভরত"

ভরত! ভরদ্বাজ! সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে গাইতে ছোট্ট একটি পাখি উড়ল গমের ক্ষেত থেকে। সোজা উঠল খানিক দূর আকাশে, তারপর থেমে গেল শূন্যে, ডানা দুটো কাঁপতে লাগল, দেখা যেতে লাগল দোদুল্যমান পা দুটো, গানের ঝরনা ঝরতে লাগল চতুর্দিকে।

ভরত—স্কাইলার্ক—শেলী-ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক!

অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। সোঁ ক'রে পাখিটা নেবে এল আবার। অদৃশ্য হয়ে গেল গমের ক্ষেতে। সুর শোনা যেতে লাগল সবুজের আড়াল থেকে, মনে হ'ল, গম-ক্ষেতেই গান গাইছে বুঝি। ভরত! ভারতবর্ষের সঙ্গে যার নাম গাঁথা! ভারতের কাব্যে পুরাণে ধর্মে রূপকথায় অমর হয়ে আছে যে নাম! সুরের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

চাষাটি ঘাস কাটতে আরম্ভ করেছিল। কবি তার কাছে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে বসবার মত জায়গা হবে একটু কোথাও ?"

"আমার ওই মাচায় গিয়ে বসতে চান তো বসতে পারেন"

কাছেই ছোট মাচাটি। কবি তার উপর উঠে বসলেন। আবার উড়ল একটা ভরত পাখি। বাদামী রঙের ছোট্ট পাখিটি। দূরবীন দিয়ে দেখলেন কবি। বাদামী রঙ, তার উপরে ঘন-বাদামীর পোঁচ চারিদিকে, অনেকটা বাঘের গায়ের মত। তাই বোধ হয় সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্রাট। অপরূপ গানে আবার পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কবির মন। মূর্ত হয়ে উঠল যেন অতীতের মাধুরী সুরের অপ্সরা-রূপে। ইতিহাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশতে লাগল ছন্দের চটুল গিটকিরি। কবি দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন এই অদ্ভুত সুরস্রষ্টাকে। তারপর খাতা বার ক'রে লিখতে লাগলেন—

প্রণাম জানা প্রণাম জানা মহৎ ও ক্ষুদ্রে
জলতরঙ্গ বাজায় ও যে সবুজ সমুদ্রে,
বিষ্ণুশর্মা চিনত ওকে, চিনত বাল্মীকি
রাম-সীতা ওর আত্মীয় যে—তোরাই ভুলবি কি ?
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

শকুন্তলার পুত্র ভরত—ভারতবর্ষ যার,
হরিণ-পাগল ভরত ঋষির গল্প চমৎকার,
নাট্য-শাস্ত্র লিখল ভরত,—ভরত বিহঙ্গ
সবুজ ক্ষেতে ছন্দে মেতে করছে কি রঙ্গ
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

সবুজ ক'রে সবুজতর গিটকিরি ছন্দে
উড়ছে সোজা আকাশপানে মনের আনন্দে
থামিয়ে ডানা মাতিয়ে দিয়ে শূন্য-উষরকে
তখ্খুনি ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজ ভূস্বর্গে
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

বৃহস্পতির পুত্র যিনি মুনি ভরদ্বাজ
অঙ্গিরা যাঁর ঠাকুরদাদা—তিনিই বুঝি আজ
সুরের ধারায় শুষ্ক ধরায় করেন নিষিক্ত
নূতন ক'রে করেন প্রমাণ আপন ঋষিত্ব
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

অরূপ দোলা দুলছে এ কি মর্ত্যে নন্দনে
আকাশ মাটি পড়ল বাঁধা সুরের বন্ধনে
স্বপ্ন এবং বাস্তবেতে প্রভেদ ঘুচে যায়
রোদের সোনায় সবুজ দোলে সুরের ব্যঞ্জনায়
প্রণাম জানা, প্রণাম জানা, প্রণাম জানা রে।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন কবি। মনে হ'ল, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চ'লে গেছে। ভারি দুর্বল বোধ করতে লাগলেন্। চোখ বুজে ব'সে রইলেন। অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। মুদিত চোখের সামনেও মূর্ত হতে লাগল অপরূপ কি যেন একটা, যা অবর্ণনীয় কিন্তু অনুভূতি-গোচর। যখন চোখ চাইলেন, তখন সেই চাষা চ'লে গেছে। কত বেলা হয়েছে, কে জানে! চারিদিকে চেয়ে দেখলেন আবার। সবুজ, সবুজ, কেবল সবুজ। সরষে ফুলে স্বর্ণকান্তি ঠিকরে পড়ছে দূরে। আরও দূরে নির্মল নীল আকাশ নুয়ে পড়েছে। দিগন্তরেখায়—সবুজ আর নীল মিশেছে যেখানে—সেখানে শিখিকণ্ঠ-কান্তি। কোন্ ময়ূর গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ওখানে! ভরদ্বাজ ডাকছে। মনে হচ্ছে, মিষ্টি-কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক পড়ছে যেন কে। সহসা তাঁর মনে হ'ল, একটা বিরাট কিছুর সামনে ব'সে আছেন তিনি। যা ঐশ্বর্যময় কিন্তু অনাড়ম্বর, দিগন্তপ্রসারী কিন্তু নিকটতম, যা সমৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। আবার কবিতা জাগল মনে—

বহমান নদীতীরে উন্মুক্ত আকাশতলে
ব'সে আছ কোন্ মহারাজ,
নাহি কোনও তূর্যনাদ উচ্চ বাদ-প্রতিবাদ
তুচ্ছ 'সাজ্ সাজ্'।

ঘনশ্যাম সিংহাসনে ব'সে আছ আপনা পাশরি
রূপে রসে পরিপূর্ণ নানা ছন্দে বাজিছে বাঁশরী
শুভ মাঙ্গলিক-মন্ত্র উচ্চারিছে শতকণ্ঠ ভরি'
শত ভরদ্বাজ
হে জনক নির্বিকার, হে রাজর্ষি আসক্তি-বিহীন,
তোমারে প্রণাম করি আজ।

কবিতাটা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত, কিন্তু বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

"আরে, আপনিও এখানে ?"

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন কবি। মাঠের সরু পথ বেয়ে গম-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক আসছেন। তাঁর পিছনে রূপচাঁদ এবং আর একজন লোক। কাছে আসতে দেখা গেল, রূপচাঁদের এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে থলি। অচেনা লোকটির হাতে ঢাকা-দেওয়া খাঁচা একটি। কবি খাতাটি পকেটে পুরে মাচা থেকে নেবে পড়লেন।

"আপনাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি একা-একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম আজ। রূপচাঁদ, তুমি আপিস যাও নি ? কটা বেজেছে ?"

রূপচাঁদ নিজের হাত-ঘড়িটি দেখে বললেন, "বারোটা। আজ রবিবার"

"ও। কোথা গিয়েছিলে তোমরা ?"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন।

"আমি বেরিয়েছিলাম লিয়াকতের উদ্দেশ্যে। কোয়েলের সন্ধানে"

"কোয়েল ? কোকিল ?"

"না, সে কোয়েল নয়। এ হচ্ছে কিউ ইউ এ আই এল—Quail। বটের। ওরাও উইন্‌টার ভিজিটার কিনা। আপনাকে দেখাবার জন্যেই বিশেষ ক'রে বেরিয়েছিলাম। লিয়াকৎ বটের পোষে আমি জানতাম, তার কাছ থেকেই আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ওদিকের ধান-ক্ষেতেও কিছু পেয়ে গেলাম আসবার সময়। রূপচাঁদবাবুর বন্দুকও ছিল। দেখবেন ? দেখাও তো লিয়াকৎ।"

লিয়াকৎ সাবধানে বটের পাখিটিকে বার করলে খাঁচা থেকে। এত সাবধানে, এত সন্তর্পণে, যেন পাখি নয়, অপরূপ নিধি।

"এটা পুরুষ। তার চিহ্ন হচ্ছে গলায় এই কালো দাগ। অনেকটা নোঙরের মত, নয় ? মেয়েদের গলা সাদা। মেয়েগুলো আকারেও একটু বড়। মেয়েদের গলার সাদাটা বুশ কোয়েল (Bush Quail), রেন কোয়েল (Rain Quail), পেণ্টেড বুশ কোয়েল (Painted Bush

Quail), এগুলোতে আরও স্পষ্ট। বাটন কোয়েল (Button Quail) ব'লে আর এক রকম পাখি আছে, তারা আসলে অবশ্য কোয়েল নয় মোটেই, তাদেরও ল্যাজ নেই। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি, গোড়াতেই সেটা বলা উচিত ছিল, কোয়েলদের বিশেষত্ব হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন, ল্যাজ নেই, তা ছাড়া এই দেখুন চারটে ক'রে আঙুল। বাটন কোয়েলদের ল্যাজ নেই কিন্তু আঙুল তিনটে, তাই তারা আসল কোয়েল নয়। এটার নাম হচ্ছে কমন গ্রে কোয়েল (Common Grey Quail), এরাই শীতকালে এ দেশে বেশি আসে। এর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে ডানায়। এই দেখুন এগুলোকে পিনিয়ন কুইল (Pinnion Quill) বলে, এর রঙটা লক্ষ্য করুন, ড্র্যাবের (Drab) ওপর বাফের (Buff) দাঁড়ি দাঁড়ি। ড্র্যাবকে কি বলবেন বাংলায়? কটা? বাফ বোধ হয় মানুষের চামড়ার রং, না? এই বিশেষত্বটা অন্য কোয়েলদের নেই তেমন। কোয়েল আছে অনেক রকমের। বুশ কোয়েলই কয়েক রকমের আছে। বাস্টার্ড কোয়েল (Busturd Quail), রেন কোয়েল, জাপানীজ কোয়েল (Japanese Quail) আছে অনেক রকম।"

কবি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছিলেন। ছোট্ট জীবন্ত ফানুস যেন একটা।

"বিদেশ থেকে আসে এরা? কতদূর থেকে?"

"বহুদূর। আফ্রিকা, সেণ্ট্রাল এশিয়া, ওয়েস্ট এশিয়াও। এদের জ্ঞাতিগুষ্টিদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে গুড ফ্লায়ার্স্ (Good fliers)—ওড়ন্দাজ বললে বাংলাটা ভুল হবে কি?"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হেসে চাইলেন কবির দিকে।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "এইটুকু পাখি অত উড়তে পারে?"

"নিশ্চয়। লোহিত সাগর, ভূমধ্য-মহাসাগর পার হয়ে চ'লে আসছে। ভেবেই দেখুন না। সেণ্ট্রাল এসিয়া থেকে যেগুলো আসে, আর বেশীর ভাগ সেখান থেকেই আসে, তাদের আবার হিমালয়

পার হতে হয়। পথে অবশ্য মারা পড়ে অনেকে। কিন্তু অদ্ভুত, নয় ?"

বৈজ্ঞানিক চাইলেন রূপচাঁদের দিকে।

রূপচাঁদ বললেন, "খেতেও অদ্ভুত !"

"তা ঠিক। মানুষের কবলে এরাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি পড়ে পাখিদের মধ্যে। আপনি কটা পেয়েছেন ?"

"বেশি নয়, গোটা-বিশেক হবে। চাখা চলবে। আপনার বাড়ি-তেই সন্ধ্যেবেলা জমা যাবে সকলে, কি বলেন ? আপনার বাইরের দিকের ওই বাবুর্চিখানাটায় সব ব্যবস্থা করবেন। আমিই রাঁধব। আনন্দ, তুমি আসছ তো ?"

"আসব। কিন্তু বেশি ঝাল দিও না"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে একবার, কোন জবাব দিলেন না।

বৈজ্ঞানিক মনে মনে বিব্রত হলেন একটু। সন্ধ্যার সময় একটা প্রবন্ধ ফাঁদবেন ভেবেছিলেন ডিম সম্বন্ধে। মুখে তবু বললেন, "বেশ তো, আসবেন। রত্না সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে"

চলতে শুরু করলেন আবার সবাই।

লিয়াকৎ অমরবাবুর দিকে চেয়ে বললে, "আমাকে এবার ছুটি দিন তবে। এঁর দেখা তো হয়ে গেল"

"হ্যাঁ, এবার তুমি যাও। তিতিরের কথা মনে থাকে যেন"

"হ্যাঁ, সে আমি যোগাড় ক'রে দেব। যোগীন্দরের আছে এক জোড়া"

কবি লিয়াকতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বটের পুষেছেন কেন ? খাবার জন্যে ?"

উত্তর দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"না না লড়াই করাবার জন্যে। মুরগীর লড়াই যেমন হয়, আগে বুলবুলির লড়াই যেমন হ'ত, তেমনই বটেরেরও লড়াই হয়। পুরুষগুলো

ভারী ঝগড়াটে। তিতিরও খুব লড়ে। লিয়াকতের বটের চ্যাম্পিয়ন এ অঞ্চলে।"

লিয়াকৎ সগর্বে নিজের বটেরটির দিকে তাকিয়ে চুমকুড়ি দিলে একবার। সঙ্গে সঙ্গে বটেরটা যেন ব'লে উঠল, "ঠিক তো ঠিক"

লিয়াকৎ বটেরকে খাঁচায় পুরে সেলাম ক'রে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চাইলেন কবির দিকে।

"অদ্ভুত শিখিয়েছে তো লিয়াকৎ! শুনলেন ডাকটা? ইংরেজেরা এ ডাককে কেউ বলে ওয়েট্ মি লিপ (Wet-me lip), কেউ বলে ডিক-বি-কুইক (Dick-be-quick)। ফাঁকা মাঠে জঙ্গলের কাছা-কাছি এই ডাক শুনে শিকারীরা বুঝতে পারে যে, বটের আছে। ওদের ওড়বার সময় একটা বিশেষ ধরনের শব্দও হয়, হুররররর গোছের। ধান-ক্ষেতে সেই শব্দ শুনেই আমরা টের পেলাম, বটের আছে। অনেক পাখিরই ওড়বার সময় একটা শব্দ হয়। ঘুঘুদের হয়, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়—"

বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতায় বাধা পড়ল। ভরত-পাখি ডেকে উঠল একটা। বিস্মিত আনন্দে থেমে গেলেন হঠাৎ তিনি ব্যায়ত আননে।

"ভরত! দেখেছেন?"

"দেখেছি। কবিতাও লিখেছি একটা"—স্মিতমুখে উত্তর দিলেন কবি।

"ও, দ্যাট্'স অল রাইট—এবার বটেরকে নিয়েও লিখুন"

"সেটা কাবাব খাওয়ার পর হবে"—কবির দিকে আড়চোখে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "কাবাবে আর কাব্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক"

কবি হাসলেন একটু। তারপর বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শীতকালের পর ওরা এ দেশ থেকে চ'লে যায় সব?"

"কিছু কিছু থেকেও যায়। ডিমও পাড়ে এ দেশে। ওদের ডিমও দেখতে চমৎকার। বাদামীর ওপর চকোলেটের ছিট-ছিট। তাই তো মনে হয় যে, ফুল্‌কি, মানে রেডস্টার্ট, হয়তো ডিম পাড়তে পারে এ

দেশে, যদি ধ'রে রাখা যায়। রেডস্টার্ট তিন রকম আছে বলেছি কি আপনাকে? ব্ল্যাক, হোয়াইট ক্যাপ্‌ড্‌ (White capped), প্লাম্‌বিয়াস (Plumbeous)—আমরা ব্ল্যাকটাকেই দেখতে পাই।"

কবির কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন একবার তাঁর দিকে। মাথা হেঁট ক'রে চলেছেন ভদ্রলোক। নীরবে পথ অতিবাহন করতে লাগলেন তিনিও। কবির মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ বেশ ছিলেন তিনি, স্বপ্নের হাট ভেঙে গেল হঠাৎ। অমরেশবাবুর বিজ্ঞান আর রূপচাঁদের বন্দুক সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে যেন। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর রূপচাঁদের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি বললেন, শুনবে নাকি কবিতা?

"কি বিষয়ে?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"বটের"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এর মধ্যেই হয়ে গেল নাকি?"

কবি আবৃত্তি করলেন—

পার হয়ে হিমালয় সাগর করিয়া জয়
উড়ে আসে ছোট ছোট পক্ষী-ফানুস
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে সোজা গতি
বটের তো নয় ওরা,—পালকের প্রজাপতি
শীতের অতিথি সব,—আহা, কি চমৎকার!
আমরাও ক'রে থাকি যথোচিত সৎকার
ঝোপে ঝাড়ে উৎসুক
ব'সে থাকি উন্মুখ
হাতে ল'য়ে বন্দুক
সভ্য মানুষ
কাবাব কোপ্তা কারি ক'রে ফেলি রকমারি
ছিল যা একটু আগে রঙিন ফানুস।

বৈজ্ঞানিক সোল্লাসে ব'লে উঠলেন, "বাঃ !"

কবির দিকে মিটমিট ক'রে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন, "আমাকে ঝাল দিতে মানা করলে, নিজে কিন্তু বেশ ঝাল দিয়েছ তো !"

৭

নিস্তব্ধ নীরব রাত্রি। সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটাতে রাত্রির রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে যেন। ডানা বিছনায় চুপ করে শুয়ে আছে। শুয়ে জেগে আছে, ঘুম আসছে না কিছুতেই। ভয় করছে না। যে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিপর্যয় অতি-দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হেনে তার আত্মীয়-স্বজন সহায়-সম্পদকে অবলুপ্ত করেছে, ভয়কেও অবলুপ্ত করেছে সেই। আর ভয় করে না। স্বয়ং মৃত্যুকে সামনে মূর্ত দেখলেও চমকে ওঠবার মত মানসিক সজীবতা তার আর নেই। অন্তত মনে হচ্ছে, নেই। সমস্ত মনটা অসাড় হয়ে গেছে। যে অদৃষ্ট-দেবতা এক নিমেষে তার সমস্ত অতীত জীবনটাকে ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে একাকার ক'রে দিয়ে গেছেন, তার এই বিধ্বস্ত বর্তমানের কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি না, তিনিই তা জানেন। এ জীবনের কোনও ভবিষ্যৎ থাকা উচিত কি না, তিনিই তা ঠিক করবেন। ডানার যেন কোনও দায়িত্ব নেই, দায়িত্ব বহন করবার শক্তিও নেই। খর-স্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করেছে সে, যেখানে গিয়ে ঠেকবে সেই-খানেই তার স্থান। সে আপত্তি করবে না, উল্লসিত হবে না, মেনে নেবে।

সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটা ঠিক নদীর ধারে। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র সৈকত দেখা যাচ্ছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত হচ্ছে মাঝে মাঝে অতি-ক্ষীণ দূরাগত হংস-কাকলীতে। দূর নদীর চরে হাঁসের মেলা বসেছে বোধ হয়। চিত্রটা কল্পনায় পরিস্ফুট

হওয়ামাত্র মনটা হাঁসের পাখায় ভর ক'রে উড়ল যেন মহাশূন্যে। মনে হ'ল, সেও যেন সত্যি উড়ে চলেছে আলোকে আঁধারে সূর্যকিরণে ঝড়ের মেঘে। জন্মজন্মান্তরের মাঠ পাহাড় সমুদ্র বনানী পেরিয়ে কোথায় চলেছে সে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল খানিকক্ষণ। 'ওয়াক্' ক'রে শব্দ ক'রে উঠল রাতের বক। ন'ড়ে চ'ড়ে শুল সে আবার। ...রাত্রি কত হয়েছে কে জানে! আনন্দবাবু যে চাকরটাকে দিয়ে গেছেন সে বাইরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে অঘোরে। রূপচাঁদবাবু, আনন্দবাবু দুজনেই লোক ভাল—হঠাৎ মনে হ'ল ডানার। রূপচাঁদবাবু সাহায্য না করলে তাকে আরও কত জায়গায় যে ভেসে ভেসে বেড়াতে হ'ত অনিশ্চিতভাবে! দুপুরের রোদ মাথায় ক'রে আনন্দবাবু তার জন্যে চাকর খুঁজে নিয়ে এলেন দূরের এক গ্রাম থেকে। অতবড় অধ্যাপক একজন। ভাল লোক দুজনেই। কিন্তু তখনই তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। যেন তার সদা-জাগ্রত অন্তরাত্মা সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলে —সত্যিই ভাল লোক কি, সত্যিই কি নিঃস্বার্থপর? মনে পড়ল প্রফেসার চৌধুরীর কথা। সে যখন বি, এ, পরীক্ষা দেয়, প্রফেসার চৌধুরী দু বেলা তার বাড়িতে আসতেন তাকে সাহায্য করবার জন্য। অক্লান্তভাবে সাহায্যও করেছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে সে কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেত না। কিন্তু তবু প্রফেসার চৌধুরীর সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা আছে, তা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়। মনে পড়ল রিসার্চ স্কলার ভাস্কর বসুর কথা...শান্ত সৌম্য বলিষ্ঠ মূর্তিটা স্পষ্ট ভেসে উঠল চোখের উপর...তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। ভাস্করের সম্বন্ধে তার মনে কোনও গ্লানি নেই, কোনও মোহও নেই। কোথায় সে এখন? এই ভীষণ আবর্তে কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে! ঠিকানাও জানা নেই যে খোঁজ করবে। খোঁজ করবার প্রেরণাও নেই মনে। তার মুদিত নয়নের সামনে এলোমেলো নানা স্মৃতির টুকরো, অসম্বদ্ধ বহু প্রশ্নের আভাস ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল জলস্রোতের খড়কুটোর মত। তার মনে হচ্ছিল, সবই বৃথা, সবই অর্থহীন।

কোন কিছুই তার মনে বিশেষ কোন সাড়া তুলছে না। তার মনে হচ্ছিল বটে, তুলছে না, কিন্তু তুলছিল। অতি সঙ্গোপনে অবচেতন-লোকে তুলছিল। তার বিধ্বস্ত চেতনার নেপথ্যলোকে অগোচরে জাগছিল নূতন আশার অঙ্কুর, নূতন কৌতূহলের ঔৎসুক্য। সে বুঝতে পারছিল না। সমস্ত শোক, সমস্ত বিপদ, সমস্ত ঝঞ্ঝার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি ক্ষতে প্রলেপ দেয়, ক্ষতিকে পূর্ণ করে, শোকের তীক্ষ্ণ-তাকে রূপান্তরিত করে সান্ত্বনার প্রশান্তিতে, সে প্রাণশক্তি তার অন্তরেও কাজ ক'রে চলেছিল অগোচরে।

...নদীর দিক থেকে দুম দুম ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কয়েকটা, সচকিত হয়ে উঠে বসল সে। তার আপাত-ঔদাসীন্যের পরদাটা ছিঁড়ে গেল হঠাৎ যেন। সেই ফাঁক দিয়ে তার মন নিমেষে নীত হ'ল আসামের জঙ্গলে, যে জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়েছিল তারা। ডাকাতদের হাতে বন্দুক ছিল। সেই বন্দুকের গুলিতেই তার বাবা, সৎ-মা আর ছোট সৎ-ভাইটি মারা যায়।...নিবিড় জঙ্গল, অদ্ভুত একটা লতার ঝোপ, তীব্র গন্ধ একটা, সামনে একটা এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ পাথর প্রকাণ্ড, তার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে সে। কেমন ক'রে পালিয়ে কি ভাবে যে ঝোপটায় ঢুকেছে, তা বুঝতে পারছে না। অনেকক্ষণ ব'সে রইল।...তারপর মনে হ'ল, এমন ভাবে ব'সে থাকাটা অনুচিত হচ্ছে, ওদের কি হ'ল দেখি...আমাদের দলটাই বা কত দূরে! পরের গ্রামে গরুর গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় এবং আগে থাকতে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে সহজে পাওয়া যাবে—এই আশায় বাবা দলের কাউকে কিছু না ব'লে একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন রাত্রে। যে লোকটা গোপনে খবর দিয়েছিল, সেই হয়েছিল পথপ্রদর্শক। ওই অঞ্চলেরই একজন লোক। সে-ই এই জঙ্গলে এনে ঢুকিয়েছিল। সে যে ডাকাতদের গুপ্তচর তা পরে বোঝা গেল। অতীতের সেই ভীষণ কয়েকটাঘণ্টা আবার ফিরে এল যেন, ডানার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল বার বার। জঙ্গলের তীব্র গন্ধটা আবার অনুভব করতে লাগল

সে যেন প্রত্যক্ষ চেতনায়···সেই রুক্ষ পাথরটা সে যেন আবার স্পষ্ট দেখতে পেলে। পাথরটার আড়ালে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল সে। কোনও হিংস্র জন্তু কিন্তু আসে নি। কেবল সাপের মত কি যেন একটা চ'লে গিয়েছিল পাশ দিয়ে, সাপ হোক, যাই হোক, কিছু বলে নি। দংশন করল বিবেক। বিবেকের দংশনে অধীর হয়েই সে বেরিয়ে এল পাথরের আড়াল থেকে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ডাকাতদের দল চ'লে গেছে নাকি? সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে মেরে এগুতে লাগল সে। চারিদিকে অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না, কোন শব্দ নেই। একটু এগিয়ে হতাশ হয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। চোখ বুজে এল আবার, সজাগ হয়ে থাকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। তারপর হঠাৎ যখন চোখ খুলল তখন সকাল হয়ে গেছে, পাখির ডাকে সারা বন মুখরিত। সে একটু বিস্মিত হ'ল, লজ্জিতও হ'ল। এত দুঃখে এমন ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেও ঘুম আসে! কিন্তু এসেছিল। আশ্চর্য! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, উঠে একটু এগিয়েই দেখতে পেলে, তিনটি মৃতদেহ পড়ে আছে সারি-সারি। তার বাবার মায়েব আর ছোট ভাইটিব। তিনজনেই উলঙ্গ। ডাকাতরা কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে কতক্ষণ সে যে দাঁড়িয়ে ছিল, তা তার মনে নেই···তারপর কেন যে তাদের ছেড়ে এসেছিল, তাও ভাল মনে পড়ছে না,—হ্যাঁ, পড়েছে, তাদের সংকারের ব্যবস্থা কববার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল সে বন থেকে। ভেবেছিল, কাছাকাছি কোনও লোকালয় যদি পাওয়া যায়, তা হ'লে হয়তো কোনও ব্যবস্থা হতে পারবে। কিছুদূর গিয়ে পথ পেয়েছিল একটা। সেই পথ দিয়ে কিছুক্ষণ চলবার পর একটা মিলিটারি লরি দেখা গেল। হাত তুলতে থামলও সেটা। নির্বিচারে বিনা দ্বিধায় সেইটেতেই উঠে পড়ল সে। 'টমি'তে ভর্তি ছিল। একটু দূরে গিয়ে একটা গ্রামে ঢুকেই নেবে পড়তে হয়েছিল। 'টমি'দের ন্যক্কারজনক অতি আপ্যায়ন সহ্য করতে পারছিল না সে। মনে হয়েছিল, এরাই সভ্যতার

বড়াই করে? এদের দেশের মিস মেয়ো নাক তুলে কথা বলে? গ্রামে দেখা হ'ল কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে শবদেহগুলির সন্ধান ক'রে সৎকার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাকে সাহায্য করলেন অনেক এবং একটা ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, এই ট্রেনটায় না গেলে ভবিষ্যতে আর যাওয়াই হবে না সম্ভবত। তাঁরা প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন কি না কে জানে!

দুম দুম দুম দুম—আবার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। হাঁসের কলরব বেড়ে উঠল যেন। উৎকর্ণ হয়ে ব'সে রইল ডানা। এখানেও ডাকাত পড়বে নাকি? নির্জন নদীতীরের প'ড়ো বাড়িতে অসম্ভব নয় কিছু। কিন্তু কি লোভে আসবে এখানে ডাকাত! বাড়িটা প'ড়ো—সেও তো নিঃস্ব। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল সে যে নিজেই একটা লোভনীয় বস্তু। সোনা-রূপো, মণি-মাণিক্য, জরি-জহরতের চেয়েও ঢের বেশী মূল্যবান। তার অঙ্গ অলঙ্কৃত করবার সুযোগ পায় ব'লে তো মূল্য ওসবের। তাকে কেন্দ্র ক'রেই তো উতলা হয়েছে মানুষের বাসনা যুগে যুগে···রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড—মহাকাব্য মহাযুদ্ধ—সবই তো তাকে কেন্দ্র ক'রেই। দানব-মানব-দেব সবাই লোলুপ আগ্রহে চেয়ে আছে তারই দিকে। 'টমি'গুলোর কথা মনে পড়ল···মনে পড়ল ইরানী সেই ভদ্র-লোকের দৃষ্টি···ভয় নয়, একটা সূক্ষ্ম গর্ব তার সারা মনে সঞ্চারিত হতে লাগল ধীরে ধীরে। বিছানার উপর হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসেছিল সে। হাত দুটি কোলের উপর ছিল। হঠাৎ সে হাত দুটি তুলে এলায়িত কুন্তলটা ঠিক ক'রে নিলে···ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করলে আয়নার অভাব।···তারপর উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল দ্বারের দিকে। অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে একটা। তার গণ্ডে অলকে গ্রীবাভঙ্গীতে তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠল বিজয়িনীর মাধুরী-মহিমা।···মানুষের গলার শব্দ—হ্যাঁ, একাধিক মানুষের।

"আমাদের ভাগ্য ভাল। অনেক রকম পাওয়া গেছে। গীজ যে পাওয়া যাবে তা আশাই করিনি"

ডানা উঠে এসে জানলাটা খুলে দিলে। জানলার নীচেই খানিকটা বাগানের মত ছিল এক কালে। সেখান থেকে সিঁড়ি নেবে গেছে নদীর তীরের দিকে। সেখানে বাঁধানো চাতাল আছে একটা, লোহার বেঞ্চিও আছে খান কয়েক। সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন, ডানা দেখতে পেলে। একজনের হাতে প্রকাণ্ড একটা পেট্রোম্যাক্স-জাতীয় আলো। টর্চও প্রত্যেকের হাতে। তাদের মুখ দেখা না গেলেও কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"কটা কি পাওয়া গেল গুনে দেখবে না?"—গলার আওয়াজে ডানা বুঝলে রূপচাঁদবাবু।

বৈজ্ঞানিক সোৎসাহে বললেন, "বেশ তো"

নিজেই গুনতে শুরু করলেন।

"নাকি হাঁস পাঁচটা, লালশর গোটা তিনেক, বারহেডেড গীজ চারটে"

"গীজের দেশী নাম নেই কোনও?"—কবি প্রশ্ন করলেন।

"রাজহাঁস বলে অনেকে। ও, আপনাকে সব দেশী নাম বলতে হবে বুঝি? গড! এই পাঁচটা হচ্ছে লেসার হুইস্‌লিং টীল, মানে শরাল হাঁস বলা হয় যাকে।"

কবির দিকে চেয়ে হাসলেন বৈজ্ঞানিক।

মুন্সি পাশে দাঁড়িয়েছিল, বললে, "এখানে সিল্‌হি বলে"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে আরও কয়েকটা হাঁস আলাদা করতে করতে বললেন, "এগুলো হচ্ছে ব্রাহমিনি ডাক্‌স—মানে চখা। এ পাঁচটা হচ্ছে আর এক জাতের লালশর, আর এগুলো সব টীল—কয়েক রকমই আছে দেখছি। বাই জোভ্—পীনটেলও পাওয়া গেছে দেখছি। এটা কি? স্মিউ—বাঃ, চমৎকার! এটাকে স্টাফ করাতে হবে।"

কবি ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন জানলার দিকে।

"উনি উঠেছেন দেখছি"

বৈজ্ঞানিক জিব কাটলেন অপ্রস্তুত মুখে।

"ছি ছি, অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না। ছি, খুব অন্যায় হয়েছে"

রূপচাঁদের অধরে এমন অদ্ভুত একটা হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল যার সম্যক অর্থ করা একটু কঠিন। চতুরতা, ব্যঙ্গ, লোভ, আঘাত-ঔদাসীন্য এবং আরও অনেক কিছুর সমন্বয় তা।

কবি বললেন, "উঠেই পড়েছেন যখন, তখন চলুন না, যাওয়া যাক বারান্দার ওপরে। এখানে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কি ?"

"কোনও অর্থ হয় না"—বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে রূপচাঁদ বললেন।

"না না, সেটা কি ঠিক হবে ?"—বৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ করলেন তাড়াতাড়ি। "এত রাত্রে একজন ভদ্রমহিলাকে এমনভাবে বিব্রত কবা, বিশেষত তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ নেই মোটে। হয়তো ভাবতে পাবেন যে, আমরা তাঁর দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে—"

"আপনারা শিকার করতে বেরিয়েছিলেন বুঝি ?"--কপাট খুলে বেরিয়ে এল ডানা।

"অনেক পাখি মেরেছেন তো ? কি ওগুলো—সব হাঁস নাকি ?"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি। ডানাব এই অতিসাধারণ প্রশ্নের অন্তরালে তিনি যেন বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসুব আকৃতি প্রত্যক্ষ করলেন।

"শুনবেন ওদের পরিচয় ?"

"বেশ তো"

"এই মুন্সি, নিয়ে আয় ওগুলোকে বারান্দার ওপর"

সবাই এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। মুন্সি হাঁসগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে সাজাতে লাগল। এক ধারে একটা ভাঙা টুল ছিল, তার ওপরে রাখা হ'ল পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটা।

"যে বেঞ্চিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায় ?"—রূপচাঁদ প্রশ্ন করলেন ডানাকে।

"ভিতরে আছে। বার করব?"

"আপনি করবেন কেন? আমরা করছি"—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন কবি। রূপচাঁদও গেলেন। দুজনে মিলে বার ক'রে নিয়ে এলেন বেঞ্চিটাকে। কবি যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, আরব্য উপন্যাসের একটা রজনী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। তিনি যেন হারুন-অল-রশিদ। অনেকক্ষণ থেকেই একটা অস্পষ্ট ভাব তাঁর মনে সঞ্চরণ করছিল। হঠাৎ সেটা কবিতার রূপে মূর্ত হ'ল।

উতলা রজনী কিসের গন্ধে,
গভীর রাতের গোপন ব্যথায়
অতনু শিল্পী অশোনা ছন্দে
কি রাগিণী গাহে অরূপ গাথায়।

এ কি অশ্রুত মোহন ছন্দ
এ কি অস্ফুট গোপন গন্ধ
কোন্ কাননের এ অচেনা ফুল
এ কবিতা লেখা কাহার খাতায়।

মদির হয়েছে নিবিড় রজনী
অধীর হয়েছে কবির চিত্ত
অসম্ভব কি হবে সম্ভব?
চির-অনিত্য হবে কি নিত্য?

হয়তো খুলিবে দুয়ার বন্ধ
হয়তো দৃষ্টি লভিবে অন্ধ
প্রত্যাশা-ভরা আকুল 'হয়তো'
অন্ধকারকে ছন্দে মাতায়।

ডানা কবির দিকে চেয়ে বললে, "বসুন"—

"আপনি বসুন আগে"—সম্ভ্রমসহকারে উত্তর দিলেন কবি।

ডানা বসল গিয়ে। ডানা বসতেই রূপচাঁদও ব'সে পড়লেন তাঁর পাশে। ঈষৎ ইতস্তত ক'রে সসঙ্কোচে কবিও বসলেন আর এক পাশে।

বৈজ্ঞানিক হাঁসগুলোকে আবার শ্রেণীবিভাগ ক'রে সাজিয়ে ফেলছিলেন। সাজানো হয়ে যাবার পর উপবিষ্ট শ্রোতাদের দিকে চেয়ে হাতে হাত ঘ'ষে বললেন তিনি, "সত্যিই কি হাঁসের বিষয় কিছু শুনবেন আপনারা? ভাগ্যক্রমে এক সোয়ান (Swan) ছাড়া আর সব রকমই পাওয়া গেছে দেখছি, এমন কি ড্যাবচিক (Dabchick) মানে পানডুবি পর্যন্ত, যা অনেকে টীল ব'লে ভুল করে—"

"বেশ তো, বলুন না"—ডানা বললে।

"বলবার আগে হাঁসের সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু বলা দরকার। জলচর পাখিমাত্রেই হাঁস নয়। হাঁসের কয়েকটা লক্ষণ আছে। ঠোঁট সোজা, ঠোঁটে দাঁতের মত খাঁজ-খাঁজ আছে ওপরে নীচে দু জায়গাতেই, পায়ের গোছ খুব লম্বা নয়, পায়ের সামনের তিনটে আঙুল জোড়া, আর একটা ছোট্ট আঙুল পেছনের দিকে আছে। এই দেখুন পানকৌড়ির পায়ের আঙুল জোড়া নয়; যদিও সাঁতার কাটবার জন্যে প্রত্যেক আঙুলে ওয়েব (web) আছে। হাঁসের শ্রেণীবিভাগ নানা রকম আছে। কিন্তু ফিন (Finn) সাহেব মোটামুটি চেনবার জন্যে যে ভাগটা করেছেন সেটা মন্দ নয়—"

রূপচাঁদ ডানার কানে ফিসফিস ক'রে বললেন, "লম্বা লেক্চার ঝাড়বে মনে হচ্ছে"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার হাঁসগুলোকে দেখছিলেন। রূপচাঁদের কথা শুনতে পেলেন না তিনি। হঠাৎ ফিরে শুরু করলেন বক্তৃতা।

"ফিন সাহেব হাঁসদের চারটে ভাগ করছেন—Swan, Geese, Mergansers, Ducks। Swan এ দেশে প্রায় দেখা যায় না।

এদের বিশেষত্ব হচ্ছে আকারে বড়, গলাটা খুব লম্বা। Goose এর গলাও লম্বা, কিন্তু এদের নাকের ছ্যাঁদাটা ওপর-ঠোঁটের ঠিক মাঝামাঝি আছে। বার-হেডেড গুজের এই দেখুন। দেহের এবং গলার তুলনায় মাথাটা ছোট। ঠোঁটও ছোট এবং একটু কম চওড়া। হাঁসদের ঠোঁটের মাঝখানে একটা নখের মত থাকে, এই দেখুন। এদেরটা একটু বড় হয়। ঠোঁটের খাঁজও দাঁতের মত, ঘাস কাটবার উপযোগী। এরা সাধারণত নদীর ধারে চ'রে বেড়ায় কিনা। এদের গায়ের রঙেরও বিশেষত্ব আছে। হয় বাদামী গোছের, না হয় পাঁশুটে, আর প্রত্যেক পালকের ধারটা একটু ফিকে রঙের, সেই জন্যে সর্বাঙ্গে একটা ডুরে-ডুরে ভাব। এরা সাধারণত উত্তর-মেরুতে থাকে। শীতকালেও বড় একটা দক্ষিণ অঞ্চলে আসে না। তবে আমাদের দেশে এই Bar-headed Geese ছাড়া আর এক রকম Grey Geese দেখা যায় শীতকালে। গীজ আরও আছে কয়েক রকম। Red-breasted, Dwarf, White-fronted, Pink-footed। তবে এ দেশে দেখা যায় না বড়। এদের সকলেরই পা হয় হলদে, আর একটু লম্বা গোছেরই, কারণ ডাঙায় হেঁটে বেড়াতে হয় কিনা। হাঁসদের তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে Mergansers। এদের বিশেষত্ব সরু ছুঁচলো ঠোঁট, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়, wind-pipe এর নীচের দিকে ফাঁপা একটা কৌটোর মত জিনিস থাকে, Bulla Ossea। এরা খুব সাঁতার কাটে, ভাল ডাইভারও। মাংসে আঁসটে গন্ধ। এরা সাধারণত আমিষ-ভোজী। এদের জাতের আমরা একটা পেয়েছি—স্মিউ (Smew)। এরাও সাধারণত আসে না এ দেশে। তারপর আসুন, চতুর্থ শ্রেণীর হাঁস—Ducks। এদের বিশেষত্ব গলা লম্বা নয়, নাকের ছ্যাঁদা মাঝখানে নয়—except in golden eye—ঠোঁটও ছুঁচলো নয়। এরা অনেক রকম species-এর হয়—উনত্রিশ রকম। এইগুলোই সাধারণত দেখি আমরা। ফিন সাহেব এদের আবার তিন ভাগ করেছেন। এক ভাগ ডাইভিং—এরা প্রায় জলেই থাকে, দ্বিতীয় ভাগ Pedestrian and Perching—

অর্থাৎ ডাঙাতেও আসে মাঝে মাঝে গাছেও দেখা যায়। আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে Surface feeders। এরা সাধারণত জলে ডুবে খাদ্য সংগ্রহ করে না, কিংবা গাছেও চড়ে না—"

"সংক্ষেপ করুন"—রূপচাঁদ বললেন। তারপর তিনি ডানার কানে কানে কি বলতেই ডানা উঠে পড়ল এবং বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে বললে, "এক মিনিট। আসছি এক্ষুনি"—বলেই চ'লে গেল ভিতরে।

"কেন, কি হ'ল ?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

"একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম। চায়ের সব সরঞ্জাম কিনে দিয়ে গেছি। চা হ'লে আরও জমবে।"

বৈজ্ঞানিক মুচকি হাসলেন একটু। যদিও ফাল্গুন মাস প'ড়ে গেছে, তবু শেষরাত্রে বেশ শীত এখনও। একটু গরম চা পেলে যে ভালই হয়, এ কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারলেন না তিনি। কিন্তু বাধা পড়াতে তিনি যে ক্ষুণ্ন হয়েছেন, তা তাঁর হাসি থেকেই বোঝা গেল। হেঁট হয়ে আবার পাখিগুলোই সরিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন তিনি।

কবি একদৃষ্টে মৃত হাঁসগুলির দিকে চেয়েছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ পাখির দল। কি সুন্দর! উন্মুক্ত ডানায় উড়ে বেড়াত নীল আকাশের নীচে। আর উড়বে না। বৈজ্ঞানিকের সত্য-সন্ধানের এই পথটাই কি ঠিক পথ ? কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে কতটা খবর পাওয়া যায় ? তা ছাড়া সত্য কি কেবল চোখে দেখবার জিনিস ? অমরবাবুর বিজ্ঞান-চর্চার এই সব নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে আগে আগে খুব কষ্ট হ'ত তাঁর। এখন আর হয় না। সহ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এখন শুধু যে কষ্ট হচ্ছে না তা নয়, আনন্দ হচ্ছে। এই মৃত মরাল-মরালীর স্তূপের উপর পা রেখেই তো তিনি উঠতে পেরেছেন মানসীর মন্দিরে এই নিবিড় নিশীথে। এই হাঁসগুলো না মরলে কি সম্ভব হ'ত এই নৈশ অভিযান ? দেবী-পূজায় এরা বলি। নূতন দৃষ্টিতে স-সম্ভ্রমে চেয়ে রইলেন তিনি মরা হাঁসগুলোর দিকে। রাজহংসটার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল,

ব্যাধশরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনই তো আদি কবিতার উৎস। সেই ক্রৌঞ্চ-মিথুন কি মরেছে? ওই রাজহংসটাকে মৃতের দলে ফেলে দিলে তো সব ফুরিয়ে গেল। ও মরে নি, চিরকাল ও প্রেরণা যোগাবে কবির মনে। কবিতা জাগতে লাগল ধীরে ধীরে। তন্ময় হয়ে ছন্দের মালা গাঁথতে লাগলেন তিনি।

রাজহংস আকাশচারী
নীল আকাশের বার্তা যাচে
নীল আকাশের খবর কি চাও?
তাও তো পাবে তাহার কাছে।

স্বচ্ছ নদীর সবুজ মাঠের
মানস-সরের অচিন ঘাটের
গোপন কথা সেই তো জানে
ফল সে খোঁজে কল্প-গাছে।

হিমালয়ের তুঙ্গ চূড়ায়
মহাদেবের জটার পাকে
কলস্বরা গঙ্গা যেমন
সোহাগ ভ'রে জড়িয়ে থাকে

সন্ধ্যা-উষায়, তড়িৎ জ্বালায়
ইন্দ্রধনুর বর্ণমালায়
চন্দ্রতারার স্বপ্নলোকে
রূপ ঢালা হয় কিসের ছাঁচে
সেই তো জানে সরস্বতীর
পায়ের তলায় কি রঙ আছে।

রূপচাঁদ একটি সিগারেট ধরিয়ে চতুর্দিকে ধূমাচ্ছন্ন ক'রে কি যে ভাবছিলেন, তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন না স্পষ্ট ক'রে। একটা

কুয়াশাচ্ছন্ন অজানা পথের প্রান্তে সংশয়াকুলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি যেন। স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আশা করছিলেন পাবেন।

৮

ডানা ভিতর থেকে এসে আবার বসল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক—

"এইবার আমরা যে সব হাঁস পেয়েছি, সেইগুলোকে দেখি আসুন। এই যে পাঁচটা দেখছেন এগুলো হ'ল Lesser Whistling Teal—বাংলায় শরাল হাঁস বলে, হিন্দী সিল্হী। এরা হচ্ছে Ducks যারা Pedestrian এবং Perching, অর্থাৎ হেঁটে বেড়াতে পারে, গাছেও চড়ে। এদের সঙ্গে Goose-এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এদের ঠোঁট এবং গোছ প্রায় সমান হয়। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে এক রকম, গায়ে বেশ বঙ আছে। Whistler চার রকম হয়। এগুলো হচ্ছে Lesser Whistling Teal। Large Whistler ও আছে এক রকম। আরও দু' রকম আছে—Wandering Whistler এবং Spotted Whistler—তারা এ দেশে আসে না, East Indies এ থাকে। হুইস্লার ছাড়াও আরও কয়েক রকম Pedestrian Perching হাঁস আছে, যেমন চখা—আমরা পেয়েছি ; নাকি হাঁস—আমরা পেয়েছি। Common Sheldrake—শাহ চখা এ দেশে আসে না প্রায়, Cotton Teal—পেয়েছি, বাংলায় এদের বলে ঘাংরিয়েল, হিন্দী গিররি। সবচেয়ে ছোট Duck এরা। শীতকালে খুব আসে। এ দেশে থাকেও। এ দেশে ডিমও পাড়ে। এদের শ্রেণীতে আরও দু' রকম আছে, Wigeon আমরা পাই নি, আর Mandarin Ducks এ দেশে আসেই না। আচ্ছা, আর কি কি

Ducks পাওয়া গেছে দেখা যাক—Pedestrian Perching-এর মধ্যে Lesser Whistling Teal, চখা, Cotton Teal"

রূপচাঁদ আর একটি সিগারেট ধরালেন।

কবি বললেন, "Pedestrian Perching-এর বাংলা করুন কিছু। বড় কটমট শোনাচ্ছে। আমি ভেবে একটা ঠিক করেছি। Swan-গুলোকে মরাল, Geese-দের রাজহংস, Mergansers না কি বললেন—"

"হ্যাঁ। আমরা একটা পেয়েছি,—এই যে, স্মিউ (Smew)"

"চমৎকার দেখতে তো!"

"চমৎকার। এদের আরও দু রকম আছে, Goosander আর Red-breasted Merganser, সে দুটো দেখতে আরও চমৎকার। এরা বরফের দেশে সমুদ্রের জলে থাকে, এ দেশে আসে না। এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা আলাদা রঙের হয় আর দুজনেই দেখতে সুন্দর"

কবি বললেন, "তা হ'লে এদের বিচিত্র-হংস নাম দেওয়া যেতে পারে এবং Ducks-দের শুধু হংস"

"বাঃ, তা হ'লে তো চমৎকার হয়। Ducks-দের মানে হংসদের তিনটে ভাগ আছে—Diving Ducks, Pedestrian and Perching এবং Surface Feeding Ducks"

কবি বললেন, "Diving Ducks ডুবুরি হাঁস, Pedestrian and Perching-দের ভূমিচর ও তরুচর বললে মন্দ কি! Surface Feeding Ducks কি রকম?"

"তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ডুবও দেয় না, কিংবা গাছেও চড়ে না। এরা জলের ওপর থেকে কিংবা মাঠে যা সামনে পায় খায়। শভেলারের (Shoveller) ঠোঁট তো অদ্ভুত, জলে ঠোঁট ডুবিয়ে যা পায় শুষে নেয়—"

"তা হ'লে এদের সম্মুখভোজী বলুন, সামনে যা পায় খায়—"

"হ্যাঁ, বেশ হবে—"

ডানা কতকগুলো হাঁসকে দেখিয়ে বললে, "ওইগুলো টীল বললেন না ?"

"হ্যাঁ, ওগুলো কটন টীল। টীল মানে ছোট হাঁস। এ অনেক জাতের আছে। এই এগুলো দেখুন—Lesser Whistling Teal, এই দেখুন এদের ল্যাজের ওপর দিকে মেরুন রঙের ছোপ রয়েছে। Larger Whistling Teal-এর ক্রীম রঙ থাকে এখানটায়। তা ছাড়াও এ দুটোও দেখুন Teal কিন্তু এরা ও-জাতের নয়, এরা হল আনন্দবাবুর নামকরণ অনুসারে সম্মুখভোজী, কমন টীল (Common Teal) যাকে বেলেহাঁস বলে। সম্মুখ-ভোজীদের দশ রকম আছে। তার মধ্যে পাঁচ রকমের স্ত্রী-পুরুষ অনেকটা একরকম দেখতে— Wood-Duck, Pink Head, Marbled Teal, Shoveller, Pintail। Pintail আমরা পেয়েছি। এর কথা পরে বলছি। স্ত্রীপুরুষ দেখতে আলাদা আলাদা—Mallard, Gadwal, Bronze cap Teal। এই Teal তিন রকম। Common Teal, Andaman Teal, আর Oceanic Teal। শেষের দুটো এ দেশে পাওয়া যায় না। আমরা পেয়েছি কমন টীল। আর এক রকম আছে—Garganey। এদের Blue-winged Teal-ও বলে। এটা কি ?—বাঃ চমৎকার! একটা Spot-bill-ও পেয়েছি দেখছি, এও হচ্ছে Mallard জাতের, Indian Mallard বলে কেউ কেউ, এর বিশেষত্ব—দুটো কমলা রঙের ফোঁটা ঠোঁটের দু পাশে কপালের কাছে। আর ডগাটা হলদে। এই দেখুন। পালকের প্যাটার্নটা অনেকটা আঁশ-আঁশ গোছের— সুন্দর, নয় ?"

"ওগুলো কি বললেন ?"—ডানা প্রশ্ন করলে।

"নাকি হাঁস—Comb-Duck। এরা হচ্ছে Pedestrian and Perching, কি নাম করলেন এর আনন্দবাবু ?"

"ভূমিচর ও তরুচর। একসঙ্গে ভূ-তরু-চরও করা যায়"

"মন্দ নয়। চলতি ভাষায় এদের 'নাক্‌টা' বলে। এদের পুরুষদের

নাকের কাছে একটা উঁচু ঢিবির মত থাকে, দেখতে পাচ্ছেন? Breeding Season-এ এটা আরও উঁচু হয়ে ওঠে। অধিকাংশ হাঁসই শীতের সময় এ দেশে আসে, এরা কিন্তু এ দেশেরই বাসিন্দা। ডিমও পাড়ে এ দেশে, গাছের গুঁড়ির ফাটলে বা গর্তে ডিম পাড়ে—"

কবি বাধা দিলেন।

"ডিমের কথা যাক্ এখন। পাখিদের পরিচয় শেষ করুন আগে—"

"আচ্ছা বেশ, ডিম নিয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। ও নিয়ে প্রবন্ধই লেখবার ইচ্ছে আছে একটা"

ডানা আর একটা হংস-স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "এগুলো কি?"

"এ দেশে ওগুলোকে লালশর বলে। অর্থাৎ লাল মাথা। কিন্তু মজা আছে, সবগুলো এক জাতের নয়। Diving Ducks, মানে ডুবুরি-হংসদের মধ্যে যেগুলো লালশর তাদের Pochard বলে। তিন রকম আছে—Red-crested Pochard, বাংলায় এদের পুরুষটাকে অনেক জায়গায় ডুমার বা ডুমার বলে। এদের পা-ও হয় লাল বা অরেঞ্জ। এরা শুধু ডুব-সাঁতারই দেয় না, মাঠে চরেও। এদের সকলেরই সাদা রঙের Wing-Bar আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার লালশর—Red-headed Pochard'এর এই Wing Bar নেই।"

"Wing-Bar কি আবার?"

"এই যে ডানার এই পালকগুলোকে Wing-Bar বলে। Red-headed Pochard-এর এটা নেই। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে এই হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লালশর। এদের বাংলায় ভুতিহাঁসও বলে, ইংরেজী—White-eyed Pochard। এদের পুরুষগুলোর চোখের বিশেষত্ব সাদা চোখ। এদের পেটের নীচেও একটা সাদা ওভাল (oval) প্যাচ আছে, এই দেখুন। যখন ওড়ে তখন দেখা যায়। ডুব-সাঁতার কাটতে এরা প্রায় অদ্বিতীয়। ডানায় এক-

আধটা ছররা লাগলে এদের ধরা শক্ত। এমন ডুব-সাঁতার কেটে কেটে লুকিয়ে বেড়াবে যে, পাত্তাই পাওয়া যাবে না। এরা নির্জন স্থানেই থাকতে ভালবাসে। ধানের ক্ষেতেও চরতে দেখেছি ভোরবেলা। উত্তর-মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে এরা প্রতি বছর শীতের সময় আসে এ দেশে। এই তো গেল ডুবুরিদের মধ্যে, লালশর ভূমি-তরু-চরদের মধ্যেও আছে। Wigeon-এর উল্লেখ আগেই করেছি, Wigeon-কেও কোথাও কোথাও ছোট লালশর বলে। আর এইটে দেখুন, ইনি হচ্ছেন সম্মুখভোজী, একেও লালশর বলে, কিন্তু ইনি হচ্ছেন Pink-headed Duck। গোলাপী লালশরও বলে কেউ কেউ। কি চমৎকার রঙ দেখেছেন! এ কিন্তু একেবারে এ দেশী পাখি। ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ—এই ধরনের ডাক। আর একটা কথা ব'লে নি—শুধু লালশর নয়, নীলশর-সবুজশরও আছে। ডুবুরি হাঁসদের মধ্যে যাকে Eastern White-eye বলে, তার মাথা হচ্ছে Dark glossy green। এ দেশে আসে না। পুলিন-বিহারীদের মধ্যে নীল বা সবুজ মাথা নেই তেমন। সম্মুখভোজী-দের মধ্যে আছে, Mallard-এর মাথা সবুজ, হিন্দীতে কিন্তু নীলশির বলে।"

ডানা মুখের সামনে বাঁ হাত রেখে হাই তুলতেই বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, বিষয়টা বোধ হয় হৃদয়রোচক করতে পারছেন না তিনি। ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। একটা হাঁস তুলে বললেন, "আচ্ছা, এটার কি বিশেষত্ব চোখে পড়ছে কোনও?"

সকলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। কোনও উত্তর বা উত্তরের আভাস কারও মুখে দেখতে পেলেন না। রূপচাঁদ গুম হয়ে ব'সে ছিলেন তাঁর ধূমাচ্ছন্ন চিন্তালোকে। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল কি না সন্দেহ। উন্মনা কবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক চিন্তায় আবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল রঘুবংশ।

ইন্দুমতী যখন স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ-মানসে প্রত্যেক রাজাই বিভিন্ন রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন। কেউ আন্দোলিত করেছিলেন লীলাকমল, কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে কেয়ূরের প্রান্ত-লগ্ন মালাটি ঠিক করেছিলেন, কেউ কনক-পাদপীঠে নখরাঘাত ক'রে করেছিলেন ইঙ্গিত, অঙ্গুলি আন্দোলন ক'রে রত্নাঙ্গুরীয়চ্ছটায় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন কেউ, কেউ নিজের রত্ন-শোভিত মুকুটে হাত দিয়েছিলেন, কেউ বামস্কন্ধ ঈষৎ উন্নমিত ক'রে প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বৃষস্কন্ধ, কেতকীপত্র ছিন্ন করেছিলেন কেউ অধীর-চিত্তে। কিন্তু এর কোনটাই তো সম্ভব নয় এখন। তাঁর মনে হচ্ছিল, স্বয়ংবরসভাতেই এসেছেন তিনি, ইন্দুমতীও এসেছে, কিন্তু কি ক'রে তাঁকে মনোভাব জানাবেন! এ কি অদ্ভুত পরিস্থিতি!

বৈজ্ঞানিকের কথায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, অমরবাবু একটা মরা হাঁস তুলে ধ'রে আছেন। চকোলেট রঙের মাথাটা ঝুলে পড়েছে একধারে। ডানাটা বিচিত্র। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

ডানা বললে, "ওর ল্যাজটা একটু বেশি ছুঁচলো মনে হচ্ছে"

"ঠিক বলেছেন। এর নামই পিন-টেল (Pintail)—এর ল্যাজের জন্য। বাংলায় এর নাম হচ্ছে দিগ-হাঁস, শোলঙ্কও বলে কেউ কেউ। পশ্চিমেরা বলে সিংক-পার। এর মাংস খেতে খুব চমৎকার। এরা আসে উত্তরমেরু থেকে। এখানে কটন টিলকে অনেকে দীঘোচ বলছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এইগুলোই দীঘোচ। বাংলা দিগ-হাঁসের সঙ্গে বেশ মিল হয়। না? এটা পুরুষ, মেয়েটা এত সুন্দর নয়। মাথায় এ রকম চকোলেট রঙ নেই, এ রকম Bronze-green Wing-Bar ও নেই"

একটু হেসে তারপর বললেন, "পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশী অলঙ্কৃত"

ব'লেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

"সব সময় অবশ্য নয়। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের মেয়েটাও কম সুন্দর নয়। তা ছাড়া, এই হাঁসেদের মধ্যে যাদের Mergansers বললাম, আনন্দবাবু যাদের বিচিত্র-হংস নাম দিলেন, তাদের Female-গুলো চমৎকার। এই যে স্মিউটা দেখছেন, এর সঙ্গিনীও কি কম সুন্দর? তার মাথাটা বাদামী, কালো নয় এর মত। Goosander-ও তাই। শাহ-চখার স্ত্রী-পাখিটাই বোধ হয় বেশি সুন্দর। সাধারণ চখার স্ত্রী-পাখিটার গলায় কেবল কণ্ঠী নেই, কিন্তু আর সবই এক। মানে—"

অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে গেলেন। যদিও এটা অবিসম্বাদিত সত্য যে পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি সুন্দর, তবু নিজে পুরুষ হয়ে একজন মহিলার সামনে জোর গলায় তা প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটু অভব্যতা প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথাটা স্পষ্টভাবে মনে হওয়ামাত্র সব গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সবচেয়ে বড় হাঁসটা কি বললেন?"—ডানাই প্রশ্ন করলে আবার।

"ও, ওটা বার-হেডেড গুজ (Bar-headed goose), এটাও পুরুষ। স্ত্রীদের মাথায় এই কালো দাগটা থাকে না। এদের গায়ের রঙ ডগমগে নয়, দেখেছেন? বেশ আভিজাত্য আছে। এদেরই আর একটা জাত এ দেশে আসে, তাদের Grey Lag বলে। তাদের গায়ের ধূসর বর্ণ একটু বেশি। Grey Lag-এর বাংলা হচ্ছে কলহংস, সংস্কৃত কাদম্ব। এরা যখন আকাশে ওড়ে, মনে হয় মালা উড়ে যাচ্ছে একটা। অনেক সময় লম্বা রেখায় ওড়ে, অনেক সময় আবার V-shaped, চমৎকার দেখায়। ডাকও চমৎকার। এরা নিশাচর। দিনের বেলা বিশ্রাম করে, রাত্রে চরতে বেরোয়। দল বেঁধে আকাশ পথে উড়ে যায় তখন ডাকতে ডাকতে। একজন ইংরেজ লেখক তা শুনে লিখেছেন, থ্রিলিং—"

"তার চেয়ে ঢের ভাল ক'রে বলেছেন কালিদাস"

কবি ব'লে উঠলেন হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক যে বাজে কচকচিতে ডানার সমস্ত মনোযোগ দখল ক'রে রেখেছেন, এ যেন সহ্য হচ্ছিল না তাঁর।

"কি বলেছেন ?"

"কামঞ্চ হংসবচনং মণি-নূপুরেষু—মণি-নূপুরের নিক্কণের সঙ্গে তিনি উপমিত করেছেন হাঁসের ডাককে। আমরা যে চোখে রাজহংসকে দেখি, সে চোখে সাহেবরা দেখতে পারবে না ওকে। আমরা ওর সঙ্গে জড়িত করেছি দময়ন্তীকে, সরস্বতীকে, যক্ষের বিরহ বেদনাকে, হিমালয়ের স্বপ্নকে, আকাশের অনন্তকে। লীলাঞ্চিতা মদালসার রূপমাধুরী, বধূদুকূল, সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনি—কত কি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে! শুধু 'থ্রিলিং' বললে কিছুই বলা হয় না।"

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, "বিজ্ঞানের ভাষা একটু সংযত কিনা। তার কেবলই ভয় হয়, পাছে সে এমন কিছু ব'লে ফেলে, যা সে প্রমাণ করতে পারবে না। কাব্যের তো সে দায়িত্ব নেই।"

"কে বললে নেই ? কাব্যও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সত্য যাচাই করবার যন্ত্র আপনাদের কাছে না থাকতে পারে, রসিকের কাছে আছে।"

ডানার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

"ওগুলো চখা বুঝি? চমৎকার রঙ তো!"

যদিও প্রশ্নটা অবান্তর তবু ডানা দেখলে, প্রশ্ন করা ছাড়া তর্কের মোড় ফিরিয়ে দেবার আর কোন উপায় নেই।

"হ্যাঁ। ইংরেজীতে বলে ব্রাহমিনি ডাক্স্"

কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সংস্কৃতে চক্রবাক"

মৃদু হেসে ডানা বললে, "সংস্কৃতে ওর আর একটা নাম বোধ হয় রথাঙ্গনামা। নয় ?"

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কবি।

"আপনি সংস্কৃত জানেন ?"

"হ্যাঁ। বি, এ-তে আমার সংস্কৃত ছিল। কালিদাসের শ্লোক মনে আছে এখনও—"

ব'লেই সে আবৃত্তি ক'রে দিলে—

অত্র বিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশবাণি
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহ মীক্ষিতানি।

আবৃত্তি ক'রেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ল একটু। নিজের বিদ্যা জাহির করার মত শোনাল যেন। কিন্তু এঁদের কাছে আত্মপরিচয় না দিয়েও সে পারলে না কিছুতে। মনে হ'ল, 'কেন দেবে না ?'

কবি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন শুধু ডানার দিকে। বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়েছিলেন। অতিশয় অবহেলাভরে তিনি যে আশ্রয়হীনাকে এই প'ড়ো বাড়িটাতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে যে হঠাৎ এমন ভাবে কালিদাস আবৃত্তি করতে পারবে, তা তিনি প্রত্যাশাই করেন নি। রূপচাঁদও করেন নি। শুধু বিস্মিত নয়, চমকে গিয়েছিলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তিনি চেয়ে ছিলেন ডানার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি চকচক করছিল।

ডানা সামলে নিয়েছিল নিজেকে।

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা, কবিরা যে কল্পনা করেছেন, চখাচখীরা সমস্ত দিন একসঙ্গে থাকে, কিন্তু রাত্রে দুজনে নদীর দু পারে চ'লে যায়, এর কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি ?"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "না। বরং এ নিয়ে ঠাট্টাই করেছেন দু-একজন। তবে দিনের বেলায় যে ওরা একসঙ্গে থাকে, মানে জোড়ায় জোড়ায় থাকে, তাতে কোনও ভুল নেই। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন।"

বৈজ্ঞানিকের এই কথায় কবি প্রতিবাদ করলেন না। কবি ল্যাণ্ডরের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে প'ড়ে গেল তাঁর— I strove with none, because none was worth my strife। তাঁর মনে হ'ল, এই সব বৈজ্ঞানিকেরা অতি অদ্ভুত রকম শিশু-প্রকৃতির লোক, সামান্য মাটির পুতুল নিয়ে মেতে থাকে, আকাশের দিকে চাইবার অবসর পায়না। উচ্চাঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ হ'লে মানুষের মুখভাব যেমন হয়, কবির মুখভাব তেমনই হয়ে উঠল। ডানার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর, তিনি নিজেও কি একটা খেলনা দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েন নি? কিন্তু তখনই তাঁর মন এ অভিযোগের জবাব দিলে কবিতায়। তাঁর মনে গুনগুন ক'রে উঠল—

তুচ্ছ ক্ষুদ্র খেলনা নয় ও
 আকাশ নেমেছে উহারই কাছে
নয়নে রয়েছে নীলের আভাস
 চাহনিতে ওর বিজলী নাচে

গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কেশ-পাশে
নিবিড় মেঘেব মহিমা প্রকাশে
মহা-আকাশের অন্ত-হীনতা
 ওই তনু-দেহে লুকায়ে আছে।

কবিতাটা আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত হয়তো, কিন্তু চা এসে পড়ল। রূপচাঁদ একটিও কথা বলেন নি এতক্ষণ। চা আসাতে ঈষৎ ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দিলেন সেটা এবং চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে চা খেতে লাগলেন নীরবে। চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল। বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত

করছিলেন, হংসবিষয়ক বক্তৃতায় অগ্রসর হওয়াটা এর পর শোভন হবে কি না।

কিন্তু ডানাই প্রশ্ন করলে আবার, "আচ্ছা, কালিদাস যে বলেছেন চক্রবাক উৎপল-কেশর খায়, তা সত্যি নাকি ?"

"জানি না। আমি যতদূর জানি, ওরা সব খায়। গুগলি শামুক পোকামাকড়, ছোট ছোট সরীসৃপ, এমন কি মড়া পর্যন্ত"

"মড়া খায় ?"

"আমি নিজের চোখে খেতে দেখি নি। বইয়ে পড়েছি—"

কবি হেসে বললেন, "ঠিকই পড়েছেন। একটা কথা কিন্তু পড়েন নি এবং বিজ্ঞানের বইয়ে সম্ভবত তা পাবেনও না। সেটা শুনে রাখুন। যে চখা-চখীরা উৎপল-কেশর খায়, নিশীথে যাদের মাঝখান দিয়ে বিরহের নদী ব'য়ে যায়, মত্তমাতঙ্গদের সংস্রব বর্জন করে যারা, তাদের নাগাল বৈজ্ঞানিক পায় নি কখনও, শিকারীব গুলিতে মারা পড়ে নি সেই হিরণ্য-হংসদম্পতি আজও।"

বৈজ্ঞানিক গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কিন্তু এক জায়গায় তাবা ধরা পড়েছে শুনেছি"

"কোথায় ?"

"কবির কল্পনাজালে"

রূপচাঁদ বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে সিগারেট ধরালেন।

ডানার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৌতুকের দীপ্তিতে।

কবি বললেন, "নিশ্চয়—"

তারপর হেসে বললেন কবিতাতে—

"কল্পনা-জাল অল্প না জেনো
নাহিক গণ্ডি পরিধি তার
অবাঙ্-মানস-গোচরও তাহাতে
ধরা প'ড়ে যায় বারংবার।"

ডানা ব'লে উঠল, "বাঃ, বেশ কবিতা তো! কার লেখা?"

চুপ ক'রে রইলেন কবি। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বক্ষ-পঞ্জরে মাথা কুটতে লাগল হঠাৎ। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না তাঁর। নীরবে ব'সে রইলেন তিনি। বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন।

"উনিই বানালেন বোধ হয়। চমৎকার কবিতা লিখতে পারেন উনি। পাখি নিয়েই কত কবিতা লিখেছেন—"

"তাই নাকি! দেখাবেন আমাকে? কবিতা বড় ভাল লাগে আমার"

কবির মনে হ'ল, কল্প-লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। মন্দাকিনীর কল্লোল শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে পারিজাতের গন্ধ। ক্ষণিকের জন্য তাঁর চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন সব। খানিকক্ষণ পরে যখন আত্মস্থ হলেন, তখন শুনলেন, বৈজ্ঞানিক শরাল-হাঁস আর বালি-হাঁসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে চলেছেন, ডানা নিবিষ্টচিত্তে শুনছে। রূপচাঁদ নীরবে ধূম উদ্গীরণ ক'রে নিজের চতুর্দিকে আবার একটা অস্পষ্টলোক সৃজন ক'রে ব'সে আছেন তার মধ্যে।

হঠাৎ মধুরকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল কে যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে। সংস্কৃত গান, সেই পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকটা—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

চমকে উঠলেন সবাই।

রূপচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল আরও।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "এখানে আর কেউ আছে নাকি?"

"আমার তো জানা নেই, আর কেউ আছে। আনন্দবাবু যে চাকরটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে-ই আছে কেবল। ওই যে—"

চাকরটা একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব।

"তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি ?"

"না তো"

"ও তবে কে ?"

"জানি না"

"মুন্সি, দেখে আয় তো, আলোটা নিয়ে যা। নদীর ধারে আউট-হাউসটার দিক থেকেই গানটা আসছে মনে হচ্ছে—"

মুন্সি আলোটা নিয়ে চ'লে যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দাটা। অদ্ভুত অনুভূতিময় অন্ধকার। মনে হ'ল, অন্ধকারের পরতে পরতে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, কিন্তু ডানার মনে হচ্ছে, তার চারিদিকে যেন আছড়ে পড়ছে অনুক্ত ভাবের অসংখ্য তরঙ্গ। দূরে অন্ধকারের ভিতর থেকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে সংস্কৃত গানটা তখনও ভেসে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল সেটা। একটু পরেই দেখা গেল, মুন্সি ফিরছে, তার পিছু পিছু আর একটি লোক। লোকটি কাছে এসেই নমস্কার করলে সকলকে। অদ্ভুত চেহারা। খুব লম্বা। মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি। খালি পা। গায়ে কালো কম্বল জড়ানো একটা। শ্যামবর্ণ। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত। ব্যক্তিটির অসাধারণত্ব লেখা রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে ?"

"আমি একজন পথিক। সন্ধ্যাবেলায় এসেছি এখানে। রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছি ওই প'ড়ো ঘরটাতে"

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে। রূপচাঁদ এটা প্রত্যাশা করেন নি। আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর কপাল।

"কোথা থেকে আসছেন আপনি ?"

"সংগ্রামপুর থেকে"

"সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে আসবার কোনও ট্রেন তো নেই !"

"আমি হেঁটে এসেছি"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরটা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন।

ত্রিশ মাইল হেঁটে আসবার কল্পনাও কেউ করে না আজকাল, বিশেষত ট্রেন আসে যখন সেখান থেকে।

"কোথায় যাবেন আপনি ?"—বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

"তা ঠিক করি নি এখনও।" তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, "আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, ওই প'ড়ো ঘরটাতে কাটিয়ে যেতে পারি দিন কতক। নদীর ধারটা ভাল লাগছে বেশ"

এই কথায় কবির অন্তর পুলকিত হ'ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "বাড়ি কোথায় আপনার ?"

"কোথাও নেই"

"কি করেন ?"

"কিছুই করি না"

এর পর কি জিজ্ঞাসা করবেন—জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে কি না—কবি ভেবে পেলেন না। চুপ ক'রে রইলেন।

কপর্চাদ বললেন, "চলে কি ক'রে আপনার ?"

"কি চলবার কথা বলছেন ?"

"পেট"

"পোস্ট-অফিসে আমার কিছু টাকা আছে, তার সুদ থেকে চলে—"

কথাটা বলে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল লোকটি, পোস্ট-অফিসে টাকা থাকাটা যেন অপরাধ। আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সবাই। লোকটিই নীরবতা ভঙ্গ করলে।

"আমি যদি কয়েকদিন ওখানে থাকি, আপত্তি আছে কি আপনাদের ? যদি আপত্তি থাকে, কাল সকালেই আমি চ'লে যাব—"

বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইনি এখানে থাকেন, এঁর যদি, অসুবিধা না হয়—"

ডানার দিকে চাইলেন তিনি। সকলেই তার দিকে চাইলেন। ডানা দেখছিল লোকটিকে। আপাতদৃষ্টিতে তার লম্বা চুল, কুঞ্চিত ঘন গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কম্বল-জড়ানো, খালি পা, দেখলে ভয় হবার কথা।

কিন্তু কিছুমাত্র ভয় করছিল না ডানার। একটা অদ্ভুত আশ্বাস যেন ক্ষরিত হচ্ছিল লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে। অতি পবিত্র, অতি নির্মল, অত্যন্ত আনন্দময় একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল যেন। ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল, নির্ভরযোগ্য একটা কিছু পাওয়া গেল। রূপচাঁদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন ডানার দিকে। চোখোচোখি হতেই তিনি বাম-চক্ষুটা ঈষৎ বুজে এবং মাথাটা ঈষৎ নেড়ে যে ইঙ্গিতটা করলেন, তার মর্ম ডানা যে বুঝতে পারলে না তা নয়, কিন্তু বুঝতে না পারার ভান করল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে সে বললে, "না, আমার কিছু অসুবিধা হবে না। ববং কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক যদি থাকেন, ভালই তো"

আগন্তুক এর পর দাঁড়িয়ে রইল আরও মিনিট খানেক।

তারপর বললে, "এবার আমি যেতে পারি কি?"

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনাকে এমনভাবে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হয়েছে আমাদেব। কিছু মনে করবেন না। নমস্কাব"

প্রতি-নমস্কার ক'রে আগন্তুক চ'লে গেলেন। তাবপবই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল একটা। পরমুহূর্তেই বোঝা গেল, রাত্রি শেষ হয়েছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সহসা পাখিবা কলরব ক'রে উঠল একযোগে। ঐক্যতান-বাদন শুরু হয়ে গেল যেন। মনে হ'তে লাগল, নাটকের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হবে এইবার।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে কবিব দিকে ফিরে বললেন, "শুনছেন?"

"কি?"

"ওই যে, ওই যে—"

কবি শুনতে পেলেন এইবার। মধুর গিটকিরিভরা একটা সুর। মনে হ'ল, প্রভাতের আলো যেন কাঁপছে। বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। নূপুরের নিক্বণ, বাঁশীর সুর, তার মাঝে মাঝে শিস

দিচ্ছে যেন কেউ, সেতারের মীড়ের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আরও কত কি—যা অবর্ণনীয়, মিনতি-ভরা আহ্বান, সোহাগ-ভরা আবেদনের সঙ্গে প্রাণ-ভরা বলিষ্ঠ সঙ্গীতময় পৌরুষের কি অদ্ভুত সমন্বয়।

কবির মুগ্ধভাবটা বৈজ্ঞানিক উপভোগ করছিলেন। যেন কৃতিত্বটা তাঁরই, সুরের নয়। উন্মনা কবি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে ছিলেন স্বচ্ছায়মান অন্ধকারের দিকে, যেন প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন অদ্ভুত এই সুর-সমন্বয়কে। আশা করছিলেন, নিজের অজ্ঞাতসারেই কোনও অপরূপ অপ্সরাকে দেখতে পাবেন বুঝি এইবার···ঘাড় ফেরাতেই চোখোচোখি হ'ল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে।

তিনি বললেন, "দোয়েল—"

"ও"

"দেখেছেন কখনও ?"

"না"

"চলুন, দেখিয়ে দিই"

তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, "আচ্ছা, চলি এবার আমরা। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, মাপ করবেন—"

তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "চলুন"

সোৎসাহে নেবে পড়লেন দুজনেই বারান্দা থেকে।

মুন্সি মরা হাঁসগুলোকে পুরতে লাগল বোরার মধ্যে।

মুন্সিও যখন চ'লে গেল, তখন রূপচাঁদ কথা কইলেন।

"আমি অবাক হয়ে গেছি। শুধু অবাক নয়, ভয় পেয়ে গেছি একটু—"

"কেন ?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আপনার সংস্কৃত শুনে। সত্যি আপনি বি, এ, পাস করেছেন ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে ?"

হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে ডানা চেয়ে রইল রূপচাঁদের দিকে।

"সত্যি নেই ?"

রূপচাঁদের চোখের দৃষ্টিতেও হাসির ঝলক খেলে গেল একটু।

নিমগাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে ডাকছিল দোয়েলটা। কবি আর বৈজ্ঞানিক দুজনেই ব'সে ছিলেন একটা ঝোপের ধারে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন, আর বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছিলেন ফিসফিস ক'রে—

"আমার মতে কোকিলের ডাক নয়, দোয়েলের ডাকই এ দেশে বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। কোকিল তো এ দেশে বারো মাসই ডাকছে। দোয়েল কিন্তু শীতকালে ডাকে না তেমন, বসন্ত পড়লে ডাকে। বাই দি বাই, আমরা যাকে কোকিল ব'লে থাকি, ইংরেজীতে তার নাম Cuckoo নয়, Koel। হিন্দীতে কোয়েলই বলে। ইংরেজীতে যার নাম Indian Cuckoo—বাংলায় তিনি হচ্ছেন 'বউ কথা কও'। একটু গরম পড়লে সেগুলোর ডাক শোনা যাবে আম-বাগানে—"

কবি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন দোয়েলের গান। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে ঢুকছিল, কিন্তু মনে প্রবেশ করছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল—

আমরা কেবল সদরে গলিতে
ধূলায় পঙ্কে কাদায় পলিতে
রঙ-বেরঙের নানান থলিতে
নানান রকম স্বার্থ ভরিয়া
করি কলরব করি বাড়াবাড়ি
করি হুড়োমুড়ি করি তাড়াতাড়ি
করি মারামারি করি কাড়াকাড়ি
অপরের শির লক্ষ্য করিয়া
কাদা ছুঁড়ি আর ইঁট মারি।

শাখার শিখরে ও দোয়েল পাখি
চটিয়া গিয়াছ তাই তুমি নাকি
পুচ্ছটি বুঝি তাই থাকি থাকি
আকাশের দিকে ধরিতেছ তুলি
হানিতে চাহিছ সবার প্রাণেতে
তীব্র মধুর তীক্ষ্ণ তানেতে
অবাধ সুরের 'মেশিন গান'-এতে
মর্ম-ভেদিনী এ কি গোলা-গুলি
গিটকারি-ভরা টিটকারি।

কবির মনে হ'ল, শীতের তীক্ষ্ণতা হঠাৎ কমে গেছে যেন। কনকনে পূবে হাওয়ার ভিতরও ভেসে আসছে যেন দক্ষিণা বাতাসের আমেজ। মানসপটে ভেসে উঠল, কর্ণিকার মুকুলের গুচ্ছ বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠেছে, অশোক-শাখা মুকুলভারনম্র। আকুল নয়নে তিনি খুঁজতে লাগলেন কোথায় নবমল্লিকার দল, কোথায় পদ্মবন···

"এদের নিকট-আত্মীয় শ্যামা মানুষের কাছে ঘেঁষে না বড়।"

কবি শুনলেন, বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছেন, কতক্ষণ থেকে ব'লে চলেছেন কে জানে!

"এরা কিন্তু খুব মানুষ-ঘেঁষা। বাগানে প্রায়ই দেখতে পাবেন। এমন কি এরা ডিমও পাড়ে আমাদেরই ঘরের কাছাকাছি। সেবার আমার মালীর ঘরের পেছনের দিকের কার্নিশে দেখেছিলাম ওদের বাসা। ডিম ওদের—"

বাধা পড়ল। পাশের ঝোপ ভেদ ক'রে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হলেন মল্লিক, সনাতন মল্লিক, তাঁর হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ভদ্রলোকের কাপড়ে লেগেছে অজস্র চোর-কাঁটা। পাঞ্জাবির পকেটটা কি লেগে যেন ছিঁড়ে গেছে। ঝুলছে। এঁদের দেখতে পেয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতিশয় কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে

এগিয়ে এলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত-ভাবে বললেন, "কাল সন্ধ্যে থেকে আপনাকে খুঁজছি"

"আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম এঁদের নিয়ে। কেন, কিছু দরকার আছে নাকি?"

"আপনার পাখির জন্যে যে ফড়িং দরকার তা তো আমি জানতাম না, সত্যি বলছি, জানতামই না। মুন্সি ব্যাটা মিছিমিছি লাগিয়েছে আমার নামে মায়ের কাছে। তিনি কাল একটা চিঠি দিয়েছেন আমাকে। কি আশ্চর্য, সামান্য ব্যাপার, আমাকে একটু বললেই চুকে যেত। ফড়িঙের ভাবনা কি, আমার বাগানে তো যথেষ্ট ফড়িং, দেখুন তো, মিছিমিছি কি কাণ্ড!"

বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা ঠিক।

বললেন, "কি চিঠি, কে দিয়েছে?"

"এই যে দেখুন না, সামান্য ব্যাপার, ছি ছি!"

একটি ছোট চিঠি বার ক'রে দিলেন তিনি।

রত্নপ্রভার চিঠি। রত্নপ্রভা গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

ওঁর পাখির জন্য ফড়িং যোগাড় ক'রে দেবার ভার আপনাকে নিতে হবে। যদি না পারেন কাজে ইস্তফা দিন, আমরা অন্য ব্যবস্থা করব।

ইতি রত্নপ্রভা

বৈজ্ঞানিক ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ ক'রে গেলেন। তারপর আড়চোখে চাইলেন একবার সনাতনবাবুর দিকে। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কি যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না।

মল্লিক ব'লে চলেছিলেন, "সামান্য ফড়িঙের জন্যে এত কাণ্ড করার দরকারটা কি ছিল মুন্সির—"

অকারণে গলাটা ঝেড়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। তবে এটা ঠিক আমার পাখিগুলো ফড়িঙের অভাবে ম'রে যাচ্ছে। গোটা পাঁচেক ম'রে গেছে—"

"আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব"

"ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, এ চিঠির কথা আমি কিছু জানতাম না"

তাঁর একবার ইচ্ছে হ'ল যে বলেন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু রত্নপ্রভার আত্মসম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে চুপ ক'রে গেলেন। মল্লিক দন্ত বিকশিত করে হেসে ফেললেন খুব খানিকটা।

তারপর বললেন, "উনি মনিব, আমি চাকর, হুকুম দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ওঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু সামান্য ফড়িং, দেখুন দিকি!"

বৈজ্ঞানিক অপ্রতিভমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"এই কথাটা বলবার জন্যেই খুঁজছি আপনাকে কাল থেকে। এক-আধটা নয়, প্রচুর ফড়িঙের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আজই লাগিয়ে দেব ছোঁড়াগুলোকে। মুন্সিকে দেবেন পাঠিয়ে, সেও ধরবে। ফড়িঙের আবার ভাবনা! আচ্ছা, চলি এবার তবে"

নমস্কার ক'রে মল্লিক চ'লে গেলেন।

কবির দিকে চেয়ে একটু হেসে বৈজ্ঞানিক আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, "হ্যাঁ, দোয়েলের ডিমের কথা হচ্ছিল। এদের ডিম চমৎকার দেখতে, বুঝলেন?"

কবি হেসে উত্তর দিলেন, "এখন একটি কথা ছাড়া আর সমস্তই অবান্তর মনে হচ্ছে আমার কাছে"

বৈজ্ঞানিক একটু থমকে গেলেন।

"সে কথাটি কি?"

"বসন্ত এসেছে। যার সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলেছেন—

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামা পবনঃ সুগন্ধিঃ
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।"

উদ্ভাসিত চক্ষে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "ও, সার্টেনলি—"

৯

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অমরবাবু। সত্যি সত্যি পাখির গান রেকর্ড করা যাবে তা হ'লে এইবার।···বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মিস্টার নিকল্সন, মিস্টার কক আর তিনি। শহর থেকে অনেক দূরে, সমস্ত কোলাহলের বাইরে। সঙ্গে আছে পার্লোফোন কোম্পানির সাউণ্ড-ভ্যানটা, তার ভিতরে আছে গান রেকর্ড করবার সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম। খুব ভাল মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোনের সঙ্গে লাগাবার তারও আছে প্রচুর। ভ্যানের ভিতরে ব'সে সুইচ লাগিয়ে দিলেই লাউড-স্পীকার বেজে উঠবে। বনের ভিতর মাইক্রোফোনের সামনে যত রকম শব্দ হচ্ছে, শোনা যাবে সব। পাখির গানও। অনায়াসেই রেকর্ড করা যাবে। অনেকগুলো অ্যাকুমুলেটারে (Accumulator) ইলেকট্রিসিটি পুরো চার্জ ক'রে আনা হয়েছে। মোমের তৈরী রেকর্ডও আছে প্রচুর। রেকর্ড অনেক আনতে হয়েছে, নষ্ট হবে অনেকগুলো। পাখি কখন গাইবে ঠিক নেই, রেকর্ড কিন্তু ঘুরিয়ে যেতে হবে ক্রমাগত। বসন্ত-বউরির গানটাই আগে তুলতে হবে। দোয়েলের তুললেই ভাল হ'ত, কিন্তু দোয়েল আজকাল ডাকছে না বেশী। বসন্ত-বউরির ডাকটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। কোকিলও অবশ্য আছে। যে রেডস্টার্টগুলো ধ'রে রেখেছেন, তাদের গান তুললে কেমন হয়? ও জায়গাটা কিন্তু বড় অসমতল। কক সাহেব বলেছেন, সাউণ্ড-ভ্যানটাকে সমতল জায়গায় দাঁড় করাতে হবে। শহরের বাইরের মাঠটাতেই ঠিক হবে। বসন্ত-বউরি পাওয়াও যাবে সেখানে প্রচুর।

···মাঠ। ইউক্যালিপ্টাস গাছের উঁচু ডালে অনেক বসন্ত-বউরি এসে জোটে ভোরবেলায়। গাড়িটাকে একটু দূরে সমতল জায়গায় দাঁড় করিয়ে মাইক্রোফোনটাকে ফিট ক'রে রাখা হয়েছে। আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে, পাখিটা যাতে হঠাৎ মাইক্রোফোন

দেখে ভড়কে না যায়। না, যায় নি। রোজ যেমন ডাকে, ঠিক ডাকছে।

···ভোরবেলা। রেকর্ড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কই বসন্ত-বউরি আজ এল না তো গাছটায়! অথচ রোজ আসে। আজ কাক ডাকছে কতগুলো। ওটা কিসের শব্দ? পাখির হতে পারে না। কুকুরের। ছি, ছি!

···কক সাহেব হেসে বলছেন, ব্যস্ত হ'লে চলবে না। আমরা একটা ব্ল্যাক বার্ডের গান রেকর্ড করবার জন্যে চেষ্টা করেছি দিনের পর দিন রোজ রাত ছুটো থেকে উঠে। অপেক্ষা করতে হবে।

···ওই এসেছে। ওটা কি হ'ল? শর্ট সার্কিট (Short Circuit) হয়ে গেল। মাটি ভিজে যে।

···আবার ঠিকঠাক ক'রে বসা হ'ল। রেকর্ডের পর রেকর্ড ঘুরে চ'লেছে।

···মোটর চ'লে গেল একটা দূরের রাস্তা দিয়ে। বাতাস উঠল জোবে। ডালপালাব হুড়মুড় শব্দে পাখির গান চাপা প'ড়ে যাচ্ছে।

···এইবার হয়েছে। বাঃ, ঠিক হয়ে গেছে—

"শুনছ, ওগো, ওঠ ওঠ—"

চোখ খুলে বৈজ্ঞানিক দেখলেন রত্নপ্রভা সামনে দাঁড়িয়ে, কক সাহেব নয়।

"স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?"

বৈজ্ঞানিকের বুকের উপব একখানা বই। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, স্বপ্নই। অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন একটা"

"রূপচাঁদবাবু এসেছেন বাইরে"

"ও"

উঠে পড়লেন বৈজ্ঞানিক।

"চা খেয়ে বেরুবে, না, বাইরেই পাঠিয়ে দেব দুজনের একসঙ্গে ?"

"তাই দাও"

রত্নপ্রভা চ'লে গেলেন। বৈজ্ঞানিক বইটার দিকে চেয়ে দেখলেন আর একবার। Songs of Wild Birds। ওদের দেশে পাখির গান সত্যিই রেকর্ড করেছে ওরা। আমাদের দেশে এসব এখন সুদূর-পরাহত। স্বপ্নই। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এ দেশের অধিকাংশ লোক দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না।

...বেরিয়ে গেলেন।

বৈঠকখানায় যাওয়ামাত্রই রূপচাঁদ বললেন, "দু-একটা বাড়তি ফার্নিচার আছে তোমার—চেয়ার, বেঞ্চি, ছোট টেবিল, এক-আধটা আলনা ?"

"কেন, কি হবে ?"

"ওই মেয়েটির দরকার। আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, একেবারে কপর্দকহীন—দরকার তো সব জিনিসই"

"গুদোমে আছে বোধ হয়। রত্না জানে ঠিক"

"এখানেই যদি পেয়ে যাই, তা হ'লে বেশি ঘুরতে হয় না আর"

"আছে আমার"

"বাঁচা গেল তা হ'লে"

রূপচাঁদের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কল্পনায় ডানার কৃতজ্ঞতা-স্নিগ্ধ মুখচ্ছবিটা ফুটে উঠল একবার।

"আনন্দবাবুর খবর কি ?"

"সেখান থেকেই তো আসছি। সে, দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড সবুজ বই নিয়ে তন্ময় হয়ে ছবি দেখছে। তুমিই দিয়েছ বোধ হয় বইটা"

"ওয়াইল্ড্ কোরাস (Wild Chorus) খানা দেখছেন বোধ হয়। আপনি দেখলেন বইটা ?"

"একটু উঁকি মেরে দেখেছি। হাঁসের ছবি"

"হ্যাঁ। অদ্ভুত বই"

চা এসে পড়াতে বইয়ের কথা চাপা প'ড়ে গেল।

কবি তন্ময় হয়ে নিজের তেতলার ঘরটায় চৌকির উপর চিত হয়ে শুয়ে Wild Chorus বইখানা দেখছিলেন। শুধু বইখানাই দেখছিলেন না, তিনি কল্পনা-নেত্রে দেখছিলেন হংস-রসিক পিটার স্কটকে, আর চেষ্টা করছিলেন তাঁর মানসলোকে ঢুকে তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-স্পন্দনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেতে। ভদ্রলোক শুধু বৈজ্ঞানিক নন—কবিও। অদ্ভুত চিত্রকর। কি চমৎকার ছবিই না এঁকেছেন! থাকেন সমুদ্রের ধারে। হাঁসের সঙ্গলোভেই শহর ছেড়ে গেছেন সেখানে। নদী যেখানে এসে মিশেছে সমুদ্রে, সেই মোহানার কাছেই এক প্রকাণ্ড 'লাইট হাউসে' (Light House) আস্তানা ওঁর। শীতকালে অজস্র হাঁস আসে সেখানে। অনেক বুনো হাঁস ধ'রে পুষেওছেন নিজে। বাড়ির তিন দিকে নোনা বালির চড়া, তারপর খানিকটা জল, খানিকটা কাদা, তারপর সমুদ্র-সৈকত। জোয়ারের সময় সবটা সমুদ্রের জলে ভ'রে যায়, বাড়িটা শুধু জেগে থাকে। চোখ বুজে কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন কবি। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সাগরের ঢেউ। তারপর আকাশ। আকাশের রঙ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কখনও নীল, কখনও ধূসর, কখনও কালো। আবীর ছড়িয়ে পড়ছে কখনও, কখনও স্বর্ণরেণু। কখনও অরুণ, কখনও গৈরিক। কত অজস্র রঙের লীলা চলেছে। আর তার মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে খামখেয়ালী মেঘের দল ভেসে ভেসে আসছে আর চ'লে যাচ্ছে। উড়ে উড়ে আসছে হাঁসের দল তুষারের দেশ থেকে।···হাঁস দেখবার জন্যে কত রকম আয়োজন করেছেন ভদ্রলোক। কত দেশে ঘুরেছেন। অস্ট্রিয়া-হাংগেরি-রুমানিয়ায়, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে, দানিয়ুব নদীর তীরে, ক্যাস্পিয়ন সাগরের সৈকতে।···কবিতা জাগল

মনে। তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে লিখতে ব'সে গেলেন। লিখে না ফেললে থাকেনা। চ'লে যায়, পালিয়ে যায়।

পাখা মেলে উড়ে চলে হাঁসেদের সারি
আর তার পিছু পিছু মানুষের মন।
রোদ-ঝড়-আলো-ছায়া-চন্দ্র-তপন
শূন্যবিহারী
অন্ধকারের বুকে তারা অগণন
সারি সারি সারি ঃ
মায়া বিস্তারি'
ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে রঙিন স্বপন
সন্ধ্যা-উষার মেঘে আলোকের অলঙ্করণ ;
দিগন্তে ধরার নেত্রে কজ্জলিত স্বপ্ন মনোহাবী ঃ
অকস্মাৎ তার মাঝে উড়ে আসে কল-কণ্ঠ হাঁসেদের সারি
সচকিয়া সমুদ্র-গিরি-মরু-বন
সাদা-মাথা, লাল-বুক, গোলাপী-চবণ,
আর তার পিছু পিছু মানুষেব মন।

লিখে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ চুপ ক'বে। বইখানা আবাব ওলটাতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হ'ল, এ ভদ্রলোক হাঁস দেখতে বেরোন নি, হাঁস ধরতে বেবিয়েছেন। হাতে আছে জাল—clap net। হাঁস ধ'রে তার পাখা ছেঁটে বা বেঁধে তাকে বন্দী ক'বে রাখবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুষ্ট মন যে। উপভোগের অন্তরালে তাই উঁকি মারছে ভবিষ্যতের ভাবনা, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। প্রকৃতির আনন্দলীলা যে অফুরন্ত, অজস্র ঐশ্বর্য যে অবারিত রয়েছে সহস্র দিকে—এ বোধ, বোধ হয়, জাগে নি এখনও ভদ্রলোকের। সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছেন তাই প্রাণপণে। ভাবছেন, ফুরিয়ে যাবে। ফুরিয়ে যাবে তুমি, ওরা থাকবে।

মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন এসে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড।

"ওগো, শুনছ, বিনয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। চিঠি পেলাম এখুনি, এই দেখ—"

বিনয় মন্দাকিনীর ছোট ভাই। কবি বইটা মুড়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর কাব্যলোক অন্তর্হিত হ'ল এবং পরমুহূর্তেই তাঁকে পানসে-কালি-দিয়ে-লেখা বানান-ভুলে-পরিপূর্ণ অর্ধমলিন পোস্টকার্ডটিতে মনোনিবেশ করতে হ'ল। 'শ্রীচরণেষু'তে 'শ' এই প্রথম দেখলেন।

মন্দাকিনী ব'লে চলেছিলেন, "শেষ পর্যন্ত ওইখানেই হল, দেখলে তো। কত ফরকটই তুলেছিল। যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে—। হ'লই বা আই. সি. এস.। তার হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকলে তার সঙ্গেই বিয়ে হ'ত। কিন্তু ও মেয়ে দিয়েছে আমার ভাইয়ের হাঁড়িতে চাল, হবে কি ক'রে অন্য জায়গায় বিয়ে? তারিখের কথা কিছু লেখে নি। অথচ বাজে কথা লিখেছে একটি গাদা। হরেন সিঙ্গির বিধবা বোনের কালাজ্বর হয়েছে, মানিক চাকরি পায় নি, বিপিনবাবুদের গাই বিইয়েছে। কাজের কথা শেষ ক'রে জায়গা থাকলে লিখতিস এসব। তা নয় রাজ্যের বাজে কথা লিখে ভ'রে দিয়েছে পোস্টকার্ডটা—"

"বিয়ের তারিখ এখনও ঠিক হয় নি হয়তো"—সন্তর্পণে কবি বললেন।

"দেনা-পাওনাও কি ঠিক হয় নি এখনও? সেইটেই তো আসল। বিনয়ের পছন্দ হয়েছে মেয়েকে খুব তা মানি, কিন্তু তা ব'লে একেবারে ফাঁকি দেবে নাকি? আমাদের নমস্কারী-টমস্কারীগুলো তো নিশ্চয়ই দেবে। আই. সি. এস. না হতে পারে, কিন্তু বিনয়ও আমাদের ফেলনা ছেলে নয়। কি রূপ, কি গুণ! ওভারসিয়ারি ক'রে মাসে চার-পাঁচশো টাকা রোজকার করে। অসময়ে বাবা মারা গেলেন তাই, তা না হ'লে ও ছেলেও আই. সি. এস. হ'ত।"

বকবক ক'রে ক্রমাগত ব'লে যেতে লাগলেন মন্দাকিনী। কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে শুনে যেতে লাগলেন। বিনয়ের কথা থেকে

এল মাসীমার কথা, তারপর যোগেনের বিয়ের কথা, তারপর বরযাত্রীর কথা, তারপর আজকালকার অগ্নি-মূল্য জিনিষপত্রের কথা, মাছ-তরকারির কথা, ধোপার কথা, সুন্দরী গরুর কথা···

কবি পোস্টকার্ডের দিকে চেয়ে সব শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এও একরকম হাঁস। নারী-বেশিনী হাঁস। মন্দাকিনীর অজস্র কথার মাঝখানে তিনি যেন শুনতে পেলেন, আংগাংক্, আংগাংক্, আংগাংক্ সেই চিরন্তন ডাক চিরপথিক হংসযাত্রীর—যে

স্থির-লক্ষ্য চলিয়াছে বেগবান নিজ পক্ষ-রথে
ঝড়ে জলে অন্ধকারে অরণ্যে পর্বতে।

১০

ডানা চুপ ক'রে ব'সে ছিল বারান্দায়। কিছুক্ষণ আগেই চেয়ার টেবিল আলনা আলমারি পৌঁছে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদবাবু। অনেক আশ্বাসও দিয়ে গেছেন। কিন্তু ঠিক যে ধরনের আশ্বাসকে মানুষ নির্ভরযোগ্য মনে করে, সে আশ্বাস পায় নি এখনও ডানা। বাইরের কোনও লোক সে আশ্বাস দিতে পারে না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তা উৎসারিত হয়। তার মনে হচ্ছিল যে, তার চারিদিকে পুঞ্জীভূত হয়েছে যে কুয়াশা, তা খানিকক্ষণ পরে অপসারিত হবে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—তবু কিন্তু অনিশ্চয়তা থাকবে। কোনও বাইরের লোকের বাচনিক আশ্বাসে তা ঘোচবার নয়। নিজের চোখে যাচাই ক'রে নির্ভয় হতে হবে। কুয়াশার ভিতর যেটাকে দৈত্য মনে হচ্ছে, সেটা আসলে যে মানুষ তা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক করছিল। তার মনের মধ্যে আর একটা সত্তা যেন গোপনে গোপনে কামনাও

করছিল—আহা, ওটা সত্যিই যদি দৈত্য হয়। হ'লে যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা ভেবে শিহরণ জাগছিল তার সর্বাঙ্গে। কৌতূহলে উন্মুখ এবং ভয়ে কণ্টকিত হয়ে ব'সে ছিল সে চুপ ক'রে। অতীতের দিনগুলোও কেমন যেন ঝাপসা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। নিজের মায়ের কথা মনে নেই তার। বিমাতার সঙ্গে কলহ হয় নি, ভাবও হয় নি। তার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা রক্ষা ক'রে এসেছে সে এতকাল। হঠাৎ সব শেষ হয়ে যাওয়াতে যেন আরামই বোধ করছে। পায়ের টাইট জুতোটা খুলে গেল যেন চিরদিনের মত, আর পরতে হবে না। বিমাতার সঙ্গে ভাব না থাকলেও ছোট বৈমাত্র ভাইটিকে ভালবাসত খুব। টুলটুলে মুখখানি। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে থাকত। যখন হাসত, তখনও। ওইটেই ছিল যেন তার দৃষ্টি-ভঙ্গী। পৃথিবীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে যেন সে বলত, যা দেখছি তা সত্যিই ভাল না কি। চ'লে গেল কোথায় চিরদিনের মত। বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার। মনে পড়ে—এইটে ভাবতেই অবাক লাগে। বাবা যে থাকবেন না, তাঁকে যে মাঝে মাঝে মনে পড়বে, এই বিস্ময়কর সত্যটার বিস্ময় কিছুতেই যেন আর কাটছে না। ট্রেনের সহযাত্রীর মত বাবাও এক জায়গায় নেবে গেলেন হঠাৎ নাম-না-জানা একটা স্টেশনে। দেখা হবে না আর কখনও। সে অথচ চলেছে। প্রতিমুহূর্তে অতিক্রম করছে নিত্য নূতন পথ। অপ্রত্যাশিতভাবে পারিপার্শ্বিক বদলাচ্ছে। নূতন দৃশ্য আসছে আর চ'লে যাচ্ছে। ট্রেনটা থেমেছে মনে হচ্ছে একটা নূতন স্টেশনে। অনেকক্ষণ থেমে আছে। নূতন যাত্রীরা উঠেছে তার কামরায়। জিনিসপত্র নাবাচ্ছে, ওঠাচ্ছে। কুয়াশা চারিদিকে, স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মানুষ ওরা? এতকাল যে ধরনের মানুষ সে দেখে এসেছে, তাদেরই মত, না, নূতন রকম কিছু? বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কৌতূহল-ভয়, লোভ-আত্মসম্মান, পরস্পরবিরোধী আলোছায়ার অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে একটা। দূরে কোথায় যেন কাঁসরঘণ্টা বাজছে, তার অতীত জীবনটাই যেন

উৎসব শুরু করেছে আর কোথাও। সে কেবল স'রে এসেছে সেখান থেকে। ওরা কেউ কোথাও যায় নি, সে-ই কেবল স'রে এসেছে। কথাটা মনে হতেই একটু অদ্ভুত ধরনের ঠেকল। সে-ই কি একলা কেবল আসতে পারে? একটা জটিল জিজ্ঞাসা-চিহ্ন যেন মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল মনের ভিতর। এ নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবসর কিন্তু সে আর পেলে না। ঘাড় ফিরিয়েই দেখলে, বৈজ্ঞানিক আর কবি নদীর ধার থেকে এগিয়ে আসছেন তার দিকেই।

একটু এসেই বৈজ্ঞানিক ব'সে পড়লেন ভাঙা সিঁড়িটার উপর তার দিকে পিছন ফিরে, তারপর দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখলেন। তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "পাখিটিকে আগে দেখে নিন ভাল ক'রে"

কবি দেখতে লাগলেন।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। ওই পাখিটাই ডাকছিল অমন ক'রে? উকু কুক্ উকু কুক্ উকু কুক্—এই ধরনের ডাকটা, নয়?"

"ক-য়ের স্থানে প-ও দিতে পারেন। হুপো, হুপোপো—এ বললেও অন্যায় হয় না। ইংরেজী নাম ওর হুপো, হিন্দীতে বলে হুদ্‌হুদ্। Upupa Epops হ'ল কেতাবী নাম"

"ওর বাংলা নাম মোহনচূড়া দেওয়া যাক—মাথায় অমন চূড়া আছে যখন। হঠাৎ মনে হয়, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান যেন পাখির বেশ ধরেছে। নয়? ফর্‌র্ ক'রে মাথার চূড়াটা আবার খুলে যাচ্ছে জাপানী পাখার মত। চমৎকার তো!"

ডানা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ইচ্ছে হ'ল, একটু আলাপ করে গিয়ে, কিন্তু সঙ্কোচ হতে লাগল। তার মনের কথা টের পেয়েই কবি যেন ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন তার দিকে।

"নমস্কার। আসুন। পাখি দেখতে বেরিয়েছি আমরা। কি চমৎকার একটা পাখি দেখুন!"

"কি নাম ওর ?"

"ইংরেজী নাম হুপো, আমি নামকরণ করলাম মোহনচূড়া। বাংলা নাম আছে হয়তো কোনও, জানি না"

"তিনটে রয়েছে দেখছি"—ডানা বললে।

"আরও বেশি থাকে"—বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন—"ওরা একটু নির্জন জায়গায় চরতে ভালবাসে, অনেকটা ঘুঘুর মতন স্বভাব। ঠোঁটটা দেখুন ভাল ক'রে, মাটি খুঁড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, তাই অনেকটা পিক-অ্যাক্সের (Pickaxe) মতো। ওদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওদের বাসা। গাছের গুঁড়িতে বা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গর্তে ওরা ডিম পাড়ে সাধারণত। ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-পাখিটা গর্ত থেকে কদাচিৎ বেরোয়। পুরুষ-পাখি তখন খাওয়ায় স্ত্রীকে। এ বিষয়ে ধনেশ পাখির সঙ্গে মিল আছে খানিকটা। ধনেশের ঠোঁটের সঙ্গেও এর ঠোঁটের মিল আছে একটু। স্ত্রী পাখিটা বাসা ছেড়ে বেরোয় না ব'লে বাসার ভেতরে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। সাদা ডিমগুলো পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে যায়। অদ্ভুত স্বভাব, নয় ? এই পাখিদেরই মধ্যে আবার কোকিল দেখুন ডিম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরের বাসায় ডিম পেড়ে চ'লে আসছে"

এই পর্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, ডানা তাঁর কথা শুনছে না।

"চমৎকার দেখতে, নয় ?"—বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত ক'রে আবার শুরু করলেন—"ওর বুকে যে রঙটা রয়েছে,সেটা ঠিক বাদামী নয়, ফন ( fawn ) অনেকটা হরিণশিশুর গায়ের রঙের মত। আবার পিঠের ডোরা ডোরা দেখলে মনে হয় জেব্রার গায়ের রঙ—"

তারপর কবির দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কিছু বলছেন না যে ?"

"আমিও মিল খুঁজছি"—হেসে উত্তর দিলেন কবি।

তারপর বললেন, "আমার বক্তব্য এখনই বলা যাবে না। লিখতে হবে"

"পাখিগুলো উড়ে গেল"—ডানা বললে।

"চলুন, আপনার ওখানেই যাওয়া যাক। লিখে ফেলি কবিতাটা"

সকলে প'ড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হলেন।

কবি গিয়েই চেয়ারটা টেনে ব'সে পড়লেন টেবিলের পাশে। পকেট থেকে বেরুল ফাউণ্টেন পেন আর খাতা। শুরু ক'রে দিলেন লিখতে।

বৈজ্ঞানিকও একটা চেয়ার টেনে বসেছিলেন, কিন্তু 'কির্‌র্‌ কির্‌র্‌' গোছের একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে উঠে পড়লেন টপ ক'রে এবং ছুটে নেবে গেলেন মাঠে, তারপর উর্দ্ধ মুখ হয়ে চোখে লাগালেন দূরবীন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। দুই বিপরীতমুখী স্রোতের কোনোটাতে গা ভাসিয়ে দিতে পারছিল না সে। ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারছিল না। তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল। কোথায় কোন্ একটা অদৃশ্য নোঙর যেন আটকে রাখছিল তাকে।

"শুনুন"

বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলেন হঠাৎ।

ডানা নেবে গেল।

"নতুন ধরনের একটা পাখি দেখুন। ওই যে—"

ডানা দেখলে, পায়রার মত একটা পাখিকে কয়েকটা কাক তাড়া করেছে।

"বাজ ওটা একটা। লাল-মাথা বাজ—Redheaded Merlin। এদের স্ত্রী-পাখিটাকে তুরমতী বলে অনেক জায়গায়। পাখি ধরার জন্যে পোষে অনেকে। কুনকী হাতীরা যেমন বুনো হাতী ধরে, এরা তেমনই নীলকণ্ঠ, হুপো, তিতির প্রভৃতি পাখি ধরে। ধরাটা যদিও একজাতীয় না। কুনকী ভুলিয়ে আনে, এরা ছোঁ মেরে ধরে। চেহারাটা সুন্দর। মাথাটা লাল, পিঠটা নীলচে, বুকে-পিঠে সাদার ওপর ছিটছিট। দেখুন"

দূরবীনটা ডানার হাতে দিলেন।

"ওই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে নিন নিজের চোখের সঙ্গে"

ডানা দেখতে লাগল।

সহসা বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, মেয়েটিকে বাজপাখীর সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞানদান করা উচিত বোধ হয়।

"বাজের ঠোঁট আর পায়ের নখ লক্ষ্য করবার জিনিস। ওদের চেনবার আর একটা উপায় হচ্ছে ল্যাজের পালকের তলায় বেশ চওড়া চওড়া ডোরা—Barred—দেখতে পেয়েছেন?"

ঘাড় নেড়ে ডানা জানালে, পেয়েছে।

"ঠিক এই রকম সাইজের আর এক রকম বাজ আছে। তাকে কেস্‌ট্রেল (Kestrel) বলে। তার মাথাটা কিন্তু নীলচে, পিঠটা লাল। এর ঠিক উল্টো"

ডানা দূরবীনটা বৈজ্ঞানিকের হাতে দিয়ে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ক'রে বসল একটা, "একটু চা খাবেন?"

"বেশ তো"—ব'লেই বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে মেয়েটির কৌতূহল ঠিক উদ্রিক্ত করতে পারলেন না তিনি। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপস্রিয়মান ডানার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। গোড়ালির উপর শাড়ির পাড়টা চোখে পড়ল। মনে হ'ল, ঠিক যেন শিকরা পাখির ল্যাজের তলার মত। ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অনুসরণ করলেন।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "কই, কি লিখলেন, পড়ুন"

ডানার দিকে কবি চাইলেন। চোখের দৃষ্টি সপ্রশ্ন উৎসুক।

"পড়ব? আশ্রমপীড়া হবে না তো?"

"না না। কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। আপনি পড়ুন। কি নিয়ে লিখলেন?"

"যে পাখিটা দেখলেন এখুনি—মোহনচূড়া—"

"ও, পড়ুন"

কবি পড়তে লাগলেন।

কি করিয়া মিল হ'ল ঘুঘু আর ধনেশে
জেব্রা ও হরিণে
সে কথা ভাবিয়া আমি মরি নে।
আমি শুধু বার বার ডেকে বলি নিজেকে
কেবা কালো কেবা সাদা কেবা উঁচু নীচে কে
সত্য কে মিছে কে
তাহার হিসাব নিক যাহারা বৈজ্ঞানিক
তুই শুধু অঞ্জলি ভরি নে।

তুই শুধু দেখ্ রে পেখম মেলেছে মন
ও মোহন চূড়াতে
গরবী সখীর হিয়া জুড়াতে, না পুড়াতে!
চঞ্চল ও চলন শুধু চলাটুকু কি
উকু কুক্ উকু কুক্ শুধু উক্ কুকু কি
ওর সুখ দুখু কি
পেয়েছে কোথাও বাণী? কোন্‌খানে? কতখানি?
ছন্দেতে পারিস কি কুড়াতে?

"সুন্দর"—অস্ফুট কণ্ঠে বললে ডানা।

"বাঃ"—সোল্লাসে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

শীত শেষ হ'ল। বসন্ত এসেছে। ঝ'রে পড়ছে অনেক গাছের পাতা। ঝরতে না ঝরতেই দেখা দিচ্ছে নব মুকুলের আভাস, পাওয়া যাচ্ছে কিশলয়দের সাড়া। বাতাসে শীতের আমেজটুকু আছে, তীক্ষ্ণতা নেই। ভোরের দিকের কুয়াশায় নিবিড়তা নেই, স্বচ্ছতা এসেছে। মসলিনের টুকরোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে দূরে দূরে। তিসির ফুল, যবের শীষ, গমের শীষ, মটরফুল, অড়রফুল ছেয়ে ফেলেছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ঘেঁটুফুল ফুটেছে চারিদিকে। শিমুলের কুঁড়ি ধরেছে। সজনেফুলের শ্বেতগুচ্ছ দেখা যাচ্ছে দু-এক জায়গায়। শিয়ালকাঁটার বনেও ফুল ফোটবার সাড়া পড়েছে, সোনালি ফানুস দুলছে গাছে গাছে। বটগাছে ফল ধরেছে অজস্র। আক কাটা হচ্ছে। পেয়ারা পেকেছে। টুনটুনি পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে দলে দলে। পুরুষ টুনটুনি পরেছে চকচকে কালো রেশমের বর-বেশ। উচ্চ রোল তুলে নীলকণ্ঠ প্রণয় নিবেদন করছে প্রেয়সীকে। বাঁশপাতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে মাটিতে। কাঠঠোকরার ক্রেংকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বেনেবউ ডাকছে নানা সুরে। টিউ—কৃষ্ণ গোকুলে—ও বউ হলুদ তোল—নানা রকম কথা বলছে সে। বুলবুলিরাও টুরু টুরু শুরু করছে ঝোপে ঝাড়ে। বসন্ত-বউরির আনন্দ-সঙ্গীত উৎসের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মাঝে মাঝে। টংক্ টংক্ টংক্—ডেকে চলেছে ভগীরথ। চন্দুল আর ভরতের গানে লেগেছে নূতন সুর। খঞ্জনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে গরুদের কাছে কাছে। শকুনি, বাজ, মুনিয়াদের বাচ্চা হয়েছে তাই নিয়ে ব্যস্ত তারা।

.. অমরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিরাট একটা পার্সেল নিয়ে। মালয় থেকে তাঁর একজন বন্ধু স্টাফ্‌ড্ (stuffed) পাখি পাঠিয়ে-

ছিলেন কয়েক রকম তাঁর জন্মদিনের উপহার-স্বরূপ যুদ্ধের আগে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে পার্সেলটা পৌঁছেছে এতদিন পরে। সর্প-ঈগলটা (Serpent Eagle) অতি অদ্ভুত রকম সুন্দর। ভীষণ অথচ সুন্দর, মাথায় পালক-গোঁজা সম্রাট যেন। কি দৃপ্ত ভঙ্গী, এর সঙ্গে এদেশী সর্প-ঈগলের মিল-অমিল কোন্‌খানে কতটুকু আছে তা তিনি বুঝিয়ে চলেছেন রত্নপ্রভাকে। রত্নপ্রভা গম্ভীর মুখে শুনে যাচ্ছেন। অনেক কিছুই বুঝছেন না, কিন্তু তাতে রস-ভঙ্গ হচ্ছে না। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি এবং নীরব গাম্ভীর্য জমিয়ে রেখেছে প্রসঙ্গটাকে। সাদা-কলার-ওলা চমৎকার মাছরাঙাটাও মন দিয়ে শুনছে যেন অমরবাবুর বক্তৃতা। ওটা যে মরাপাখি তা মনেই হচ্ছে না। বহুবর্ণবিশিষ্ট পিট্টা (Pitta) প'ড়ে আছে কাত হয়ে এক ধারে। পিঠে-চুল হলদে-বুক বুলবুলিটার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। লাল-ঘাড় নীল-পিঠ টিয়া ব'সে আছে গ্রীবাভঙ্গী ক'রে। মৃত্যুও তার গর্ব অপহরণ করতে পারে নি যেন। ক্রমাগত ব'কে চলেছেন অমরবাবু। যে পক্ষীনিবাস তিনি তৈরি করতে চান, তার কল্পনায় মেতে উঠেছে তাঁর মন। রত্নপ্রভারও।

·

·· চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন মন্দাকিনী। চৈত্র মাস এসে গেল, অথচ চাল কেনা হ'ল না এখনও। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে রোজ রোজ। মাঘের মধ্যেই সারা বছরের মতন চাল কিনে ফেলেন তিনি। এবারও ফেলতেন, কিন্তু রূপচাঁদবাবু দাঁও মাফিক কিনে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব'লে অপেক্ষা করছেন। রূপচাঁদবাবুর কিন্তু পাত্তা নেই। একটি বিষয়ে কিন্তু মন খুশি আছে তাঁর। মনের মত ক'রে দুটি লেপ করাতে পেরেছেন এবার। চমৎকার ছিটটি। ধুনকর ডাকিয়ে সামনে ব'সে বার বার ক'রে ধুনিয়ে, চক্রাকার সেলাই দিয়ে মনোমত ক'রে করেছেন লেপ দুটি। রূপচাঁদবাবুর দৌলতেই হয়েছে। তাই আশা করছেন যে, চালের ব্যবস্থাটাও ক'রে দেবেন উনি।

···উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বকুলবালা দিন গুনছেন, কবে পাখি-ওলা হলদে পাখি বেনেবউ এনে দেবে তাঁকে। পাখি-ওলাটা রোজই বলে, এখনও পায় নি। অথচ সামনের আমগাছে প্রায়ই তো দেখা যায়। কি সুন্দর রঙ, সোনা ঠিকরে পড়ছে যেন গা থেকে। ওই রঙের শাড়ি আছে একখানা তাঁর। পাখিটা যখন আসবে, তখন তিনি যে কি করবেন, তারই কল্পনায় তন্ময় হয়ে আছেন তিনি। বেনেবউ এলে মদনলাল সোহাগী হিংসেয় ফেটে পড়বে নিশ্চয়। তা পড়ুক, ওরা হিংসুটে ব'লে নতুন পাখি পুষবেন না তিনি বুঝি! আচ্ছা আবদার তো!

হলদে পাখির স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে বকুলবালার শিশুমন।

···সবজিবাগের প'ড়ো বাড়িটার কাছে যে নদীটা আছে, বর্ষার সময় তার কূল ছাপিয়ে যায়, আশপাশের ডোবাগুলোতে জল ঢোকে এসে। মাছও ঢোকে। এইরকম একটা ডোবার ধারে ছিপ ফেলে ব'সে আছেন রূপচাঁদ। বকও ব'সে আছে কয়েকটি। মাথার উপর দিয়ে টিয়া উড়ে গেল এক ঝাঁক। টেলিগ্রাফ-পোস্টের উপর ব'সে একটা ফিঙে পাখি ঝনৎকার দিয়ে ধমকাচ্ছে যেন কাকে। তীরের একটা গাছের পাতায় আত্মগোপন ক'রে হাঁড়ি-চাঁচা মাঝে মাঝে 'কক্‌রিং কক্‌রিং' শব্দ ক'রে প্রিয়াকে ডাকছে। রূপচাঁদের কিন্তু লক্ষ্য নেই এসব দিকে। ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে ব'সে আছেন তিনি।

···ডানা ব'সে আছে চুপ ক'রে বারান্দার উপর। আসন্ন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে তার মনেও, কিন্তু সজ্ঞানে সে অনুভব করছে না কিছুই। উতলা হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। অতীতের তীর-ভূমির দিকে চেয়ে আছে সে, দূরে স'রে যাচ্ছে সেটা ক্রমশ। বর্ত-মানের নানা চিত্র ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের স্বীকার করতে বাধছে, অস্বীকার করতেও পারছে না। অদৃশ্য ভবিষ্যতের জয়গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কোন্ অদৃশ্য কবি। অস্পষ্ট সুরটা শোনা যাচ্ছে

কেবল, তাও নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়। তার সঙ্গে মিশছে এসে কোকিলের কুহু, পাপিয়ার 'পিউ কাঁহা', বায়সের চীৎকার, বসন্তের স্বরোচ্ছ্বাস। অনিবার্য বর্তমানের অকুণ্ঠিত অসংখ্য দাবী।

···নিজের তেতলার ঘরটিতে ব'সে কবি কবিতা লিখছিলেন।

আজ বিকেলে হঠাৎ যেন
দেখতে পেলাম পাঞ্চালীকে
ইচ্ছামতীর উচ্চ পাড়ে
খুঁজছে বাসা গাংশালিকে।

কঠিন গাছে কোমল গুটি
রঙিন হয়ে উঠছে ফুটি
ব্যাসের মুখে ফুটছে ভাষা
কোথায় তুমি অম্বালিকে।

জাগছে জীবন ভুবন-ভরা
সকল দ্বিধা শঙ্কা ঘোচে
শবের বোঝা সরিয়ে নে' যায়
মৃত্যু যেন সসঙ্কোচে।

জীবন-যাগের আগুন ফুঁড়ে
কৃষ্ণা জাগে বিশ্ব জুড়ে
স্বয়ম্বরের বিরাট সভায়
গান ধরেছে বৈতালিকে।

কৃষ্ণা আজও পার্থে মাগে
বহ্নি জ্বলে তন্বী-চোখে
শিক্‌রে বাজের পুলক জাগে
সমুদ্যত চঞ্চু-নখে।

সবুজ-লালে স্বর্ণ-পীতে
আগুন-মাখা বর্ণ-গীতে
কোন শবরী অর্ঘ্য সাজায়
বসন্তের এ বৈকালিকে।

ঝনাৎ ক'রে কপাট ঠেলে প্রবেশ করলেন মন্দাকিনী। কবিতার খাতাটা তাড়াতাড়ি মুখে ফেললেন কবি।

মন্দাকিনী খাতাটার দিকে এক নজর চেয়ে অসংকোচে বললেন, "কি যে বাজে কাজে সময় নষ্ট করছ তুমি সারাদিন ব'সে ব'সে! চালের ব্যবস্থা কর। রূপচাঁদবাবুর তো পাত্তাই নেই।"

অপ্রতিভ মুখে চেয়ে রইলেন কবি। কিছু একটা বলতেন হয়তো, কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠলেন। অঘটন ঘ'টে গেল একটা যেন। সুরের অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ তুবড়ির মত আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বাতায়নপথে শুনতে পেলেন এ বছরের প্রথম পাপিয়ার ডাক—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—। চোখের অপ্রতিভ দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর, মন উড়ে গেল আকাশে, গুনগুনিয়ে উঠল কবিতার দুটো লাইন—

চোখ গেলে কি গান ধরে কেউ
অমন ধারা তান তুলে?
চোখ যায় নি মন গিয়েছে
বল্ না সেটা প্রাণ খুলে।

মন্দাকিনী বিরক্ত মুখে চেয়ে ছিলেন স্বামীর দিকে। তাঁর বিরক্তির কারণ, তিনি নিজের আকাশে উড়তে পারছিলেন না। সবাই নিজের নিজের আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায়।

**প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত**

## বনফুলের কয়েকখানা ভাল বই ঃ—